ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নেহরু বাল পুস্তকালয়

বড়পানি

রচনা ঃ লীলা মজুমদার
ছবি ঃ পুলক বিশ্বাস
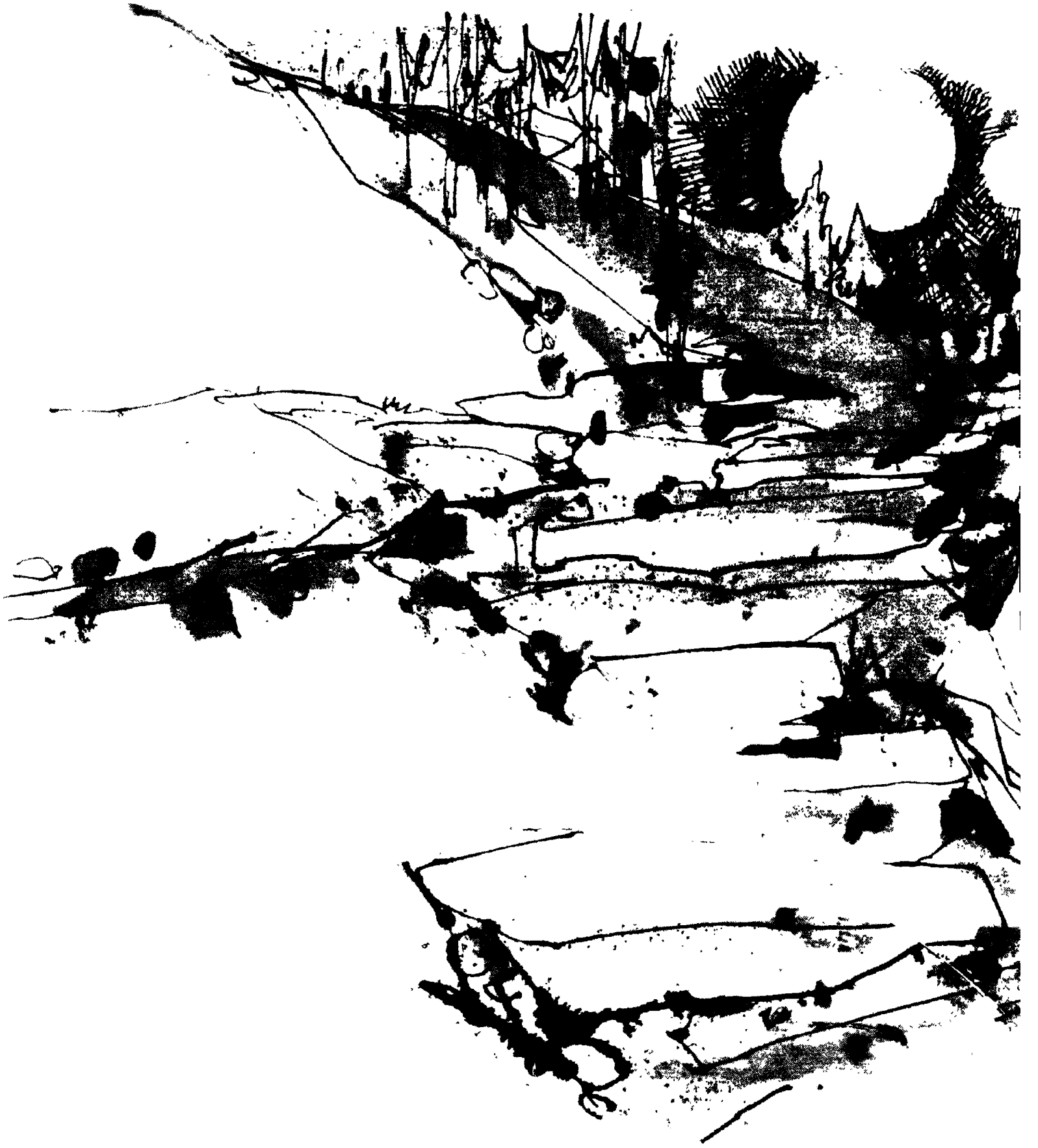
প্রথম প্রকাশ : 1972 (শক 1894)
দ্বিতীয় মুদ্রণ : 1989 (শক 1911)

মূল্য : 6.00 টাকা
Barapani (*Bengali*)
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত।

বড়পানি

পাহাড়ের নিচে সমান জমিতে লাল ছাদ-ওয়ালা স্কুলবাড়ি থেকে কানু সমানে উপর দিকে ছুটে চলল। মাঝে কুল-কুল করে বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ে নদী, তার উপরে খুদে কাঠের পুল, সেই পুল পেরিয়ে কানু দৌড়ল। রবিবারে আর ছুটির দিনে নানার সঙ্গে এইখানে এসে কানু মাছ ধরত। পুলের তলায় চ্যাপ্‌টা পাথরে ওরা বসে থাকত, মাথায় ছায়া পড়ত, পা রাখত রোদে। নানা বলত রোদ লাগা পাথর থেকে নাকি ওর শিরদাঁড়া বেয়ে গরম ওঠে, ভারি আরাম লাগে।

পাহাড়ের গায়ে কাটা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠলে, বাড়ি পৌঁছতে লাগে ঠিক দশ মিনিট। দশ ধাপ উঠতে হয়, তারপর একটা বাঁক, আবার পাঁচ ধাপ উঠতে হয়, তারপর আরেকটা বাঁক, ফের দশ ধাপ ওঠা,

এমনি করে সোজা মুলকি অবধি উঠে যেতে হত। মুলকি ওদের নিজেদের পাড়া। দেখে মনে হয় পাহাড়ের কিনারা আঁকড়ে ঠিক যেন ঝুলে রয়েছে। কানুর শোবার ঘরের জানলা থেকে, ধানখেতির নিচু জমির উপর দিয়ে, ওপারের পাহাড়ে জরীপ বিভাগের পুরনো আপিসের জানালার ভিতর দেখা যেত বড় শহরের হেড-আপিসে বদলি হবার আগে বাপু ঐখানে কাজ করত।

এদিকে পাহাড়ের গায়ে যত বাড়ি, প্রায় প্রত্যেকটার রান্নাঘরের পাশ দিয়ে কানুকে উঠতে হত।

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে কোন বাড়িতে সে রাতে কি খাওয়া হচ্ছে, সব কানুর জানা হয়ে যেত। তারপর নিজেদের বাড়ির পিছনের ছোট লাল ফটক ক্যাঁচ করে খুলে কানু ভিতরে ঢুকত।

মাঝে মাঝে আসবার পথে যারা বাড়িতে বসে রান্না করত, তারা জানলা দিয়ে কানুকে দেখে, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করত মা কেমন আছে, বাবার চিঠি এল কি না, এই সব। অনেক সময় তারা ওকে এটা-ওটা খেতেও দিত, কানু সেগুলো চিবোতে চিবোতে উপরে উঠত। হয়তো মচমচে ভাজা কিছু, কিম্বা একটা মিষ্টি বা পাকা এপ্রিকট ফল। মা কিন্তু এ সব পছন্দ করতেন না। মার বাপের বাড়ি বাংলায়, অজয় নদীর ধারে। সেখানে সব-ই অন্য রকম।

জমি সেখানে চাপাটির মতো চ্যাপ্টা। মাটি টকটকে লাল, এখানে-ওখানে ভেঙ্গে গেছে, তাকে বলে খোয়াই। গাঢ় সবুজ শালবনের মধ্যে দিয়ে গরম বাতাস বয়। চৈত্র মাসে বহু দূর থেকে দেখা যায় শালবনের মাঝখানে আগুনের মতো রঙের ফুলে-ভরা একটিমাত্র পলাশ গাছ দাঁড়িয়ে। কানু কখনো সমতল জমি দেখে নি।

ছোট ঘাস জমিটুকু পার হয়ে, তিনটি পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠেই কানু ডাক দিল, "মা! নানা! কোথায় তোমরা? আমার খিদে পেয়েছে!"

অমনি সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে এল; খাবার-ঘরের স্প্রিঙ্গের দরজা ঠেলে মা; বারান্দার কোণে তার ছোট ঘরটি থেকে পা ঘষতে ঘষতে নানা, হুদ্দকুঁড়ে বেড়াল মিয়াও আর লোমে ঢাকা পাহাড়ী কুকুর ভৌ ভৌ। সে এক মিনিটও চুপ করে বসে থাকতে পারত না।

ব্যস্ত হয়ে নানা জিজ্ঞাসা করল, "তোদের মুরগিরা আজ কটা ডিম দিল ?" মা গেলেন চটে, "ঐ আপনার অভ্যাস, কাকা, ছেলেটা এখনো মুখে এক দানা খাবার দিল না, অমনি যত রাজ্যের বাজে কথা ! ডিমের জন্য কার এসে যায় শুনি ?" নানার চকচকে চোখ থেকে হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। কানু স্কুলের ব্যাগটা মাটিতে ফেলে, নানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার চিমড়ে গলা ধরে ঝুলে রইল। বলল, "আমার এসে যায়, নানা। চোদ্দটা ডিম তুলেছি আমরা, ভাবতে পার নানা ? তাও ভাঙ্গাটা বাদ দিয়ে !"

মা নাকসিঁটকে বললেন, "কুড়িটা মা-মুরগির চোদ্দটা ডিম, হুঁঃ! আর হাসাস্ না। এবার স্কুলের জুতো খুলে, হাত ধুয়ে, খাবি আয় দিকিনি। লুচি হয়েছে, আমাদের গাছের মটরশুঁটি দিয়ে নতুন আলুর দম। তার উপর পাহাড় থেকে নানা ছোট ঝুড়ি বোঝাই করে রাস্প-বেরি তুলেছেন, রোদ লেগে এখনো কেমন গরম হয়ে আছে দেখিস্।

বাড়িটাকে কানুর বড্ড ভালো লাগে। কেমন সাদা চূণকাম করা দেয়াল, লাল করুগেটের ছাদ, সবুজ রঙ-করা দরজা জানলা। অনেক নিচে, পাহাড়ের পায়ের কাছে, ছোট নদীর ধারে, ঠিক যেমন করে পাখি তার বাসায় বসে, তেমনি যেন বসে রয়েছে ওদের খুদে স্কুলবাড়িটি। বিকেলের দিকে সেখান থেকে কানু দেখতে পেত বাড়ির জানলার কাঁচে কেমন রোদ পড়েছে। কাঁচগুলো যেন ওকে ডেকে বলতে চাইছে, "এই যে আমরা, তোমার জন্য এখানে বসে আছি!"

কানুদের নিজেদের তরি-তরকারির বাগানে, উ-বিন মালি মিষ্টি মিষ্টি গাজর, সবুজ বাঁধাকপি আর টকটকে লাল মূলো ফলাত। কত বিদেশী ফলের গাছ ছিল, প্লাম, পীচ, আর একটি "স'ফ"' গাছ, অনেকটা বুনো আপেলের মতো, একটু লম্বাটে দেখতে, বেশ টক। কিন্তু কাঠের আগুনে পুড়িয়ে নিলে সে যা ভালো খেতে!

কানু নানাকে বেজায় ভালোবাসত। নানার আটাত্তর বছর বয়স, দেখতেও একটা শুকনো লাল আপেলের মতো।

মা বলতেন নানা নাকি ওদের কেউ হয় না। বাপির বাবা দাদু ছিলেন, তাঁর বন্ধু। অনেক দিন আগে দাদু যখন বেঁচে ছিলেন, তিনি আর নানা একসঙ্গে বন-বিভাগে কাজ করতেন। এখন দাদু নেই আর বাপিও পাহাড়ের নিচে সমান জায়গায় বড় শহরে কাজ করে। বাপিও নানাকে বেজায় ভালেবাসে। বাপি বলে, যা কিছু ভালো জিনিস তার জানা আছে, সে-সবই নাকি নানার কাছে শেখা। যদিও নানা চোদ্দ বছর বয়সেই স্কুল ছেড়ে বন-বিভাগে চাকরি নিয়েছিল। প্রথমে নানা ফাই-ফরমায়েস খাটত, পরে দাদুর মতোই বন-বিভাগের পাহারাদার হয়েছিল।
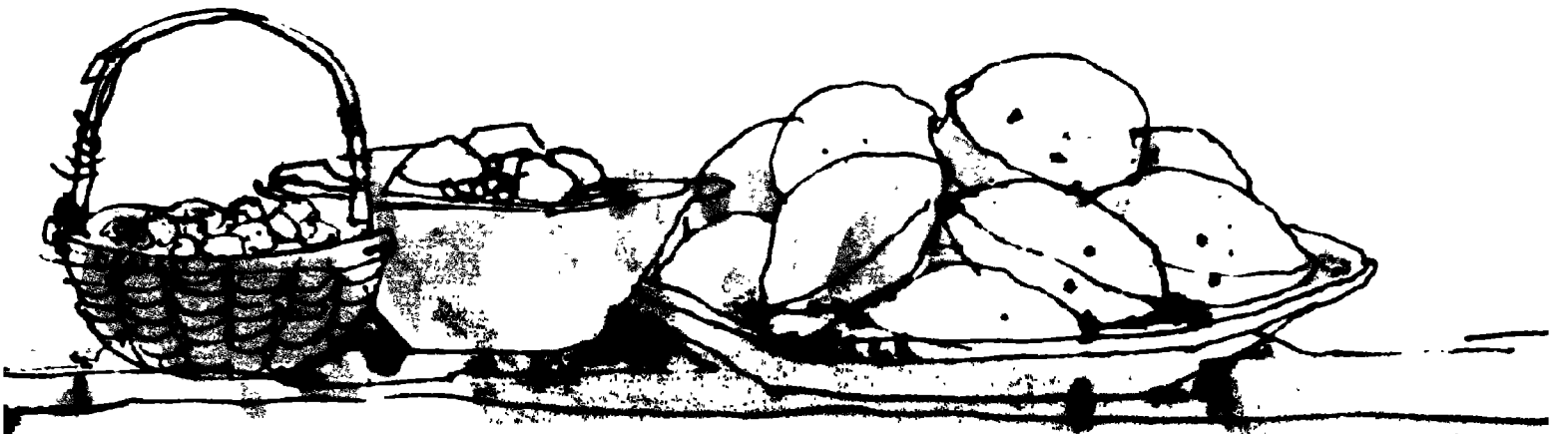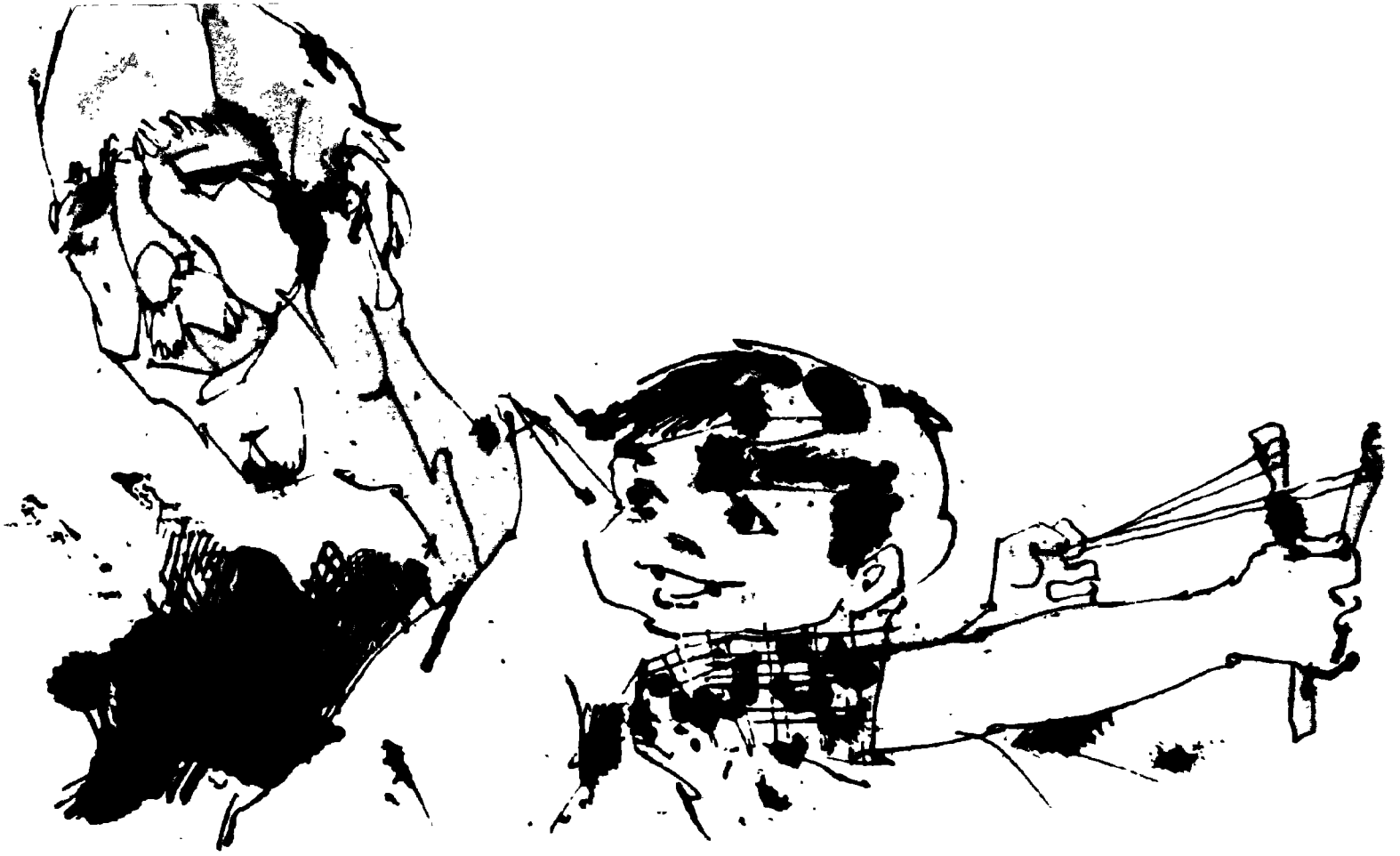
দুই

কানু জিজ্ঞাসা করল, "আজ আমরা কি করব, নানা? ঐ যে তুমি নতুন গুলতি বানিয়েছে, ওটা নিয়ে দুষ্টু বাজ-পাখিটাকে মারব, সেই যেটা উ-বিনের পায়রার ছানা মেরেছে?"

মার বেজায় ভয়। "না, না, বাজপাখির মতো হিংস্র জানোয়ার মেরে কাজ নেই। শেষটা যদি ছোঁ মারে! তার চেয়ে বরং নিমগাছের কয়েকটা কাক মারা ভালো। যা চোর বদমায়েস ওরা!"

নানা চুপ করে রইল। পরে কানুকে বলল, "ওগুলো সাধারণ কাক নয়, দাদা, ওরা দাঁড়কাক। ওদের পোষ মানিয়ে, কথা বলতে শেখানো যায়। ভারি মজার হেঁড়ে গলা ওদের, সত্যিকার বুড়োমানুষদের মতো খিক-খিক করে হাসতেও পারে। এক সময় আমার একটা দাঁড়কাক ছিল।"

কানু চ্যাঁচাতে লাগল, "আঃ, থামলে কেন, নানা? দাঁড়কাকটার কি হল? দাদুও দেখেছিলেন নাকি তাকে?"

"তা আর দেখে নি! আরে, আমরা তখন যে এই মুলকির-ই উপরে ঐ সংরক্ষিত বনে পাহারা দিতাম। একবার ভীষণ ঝড় হল। ঝাউগাছের মগ-ডালের বাসা থেকে খুদে একটা দাঁড়কাকের ছানা বাতাসে উড়ে মাটিতে পড়ল। কাঠুরেদের ছেলেরা সবার আগে ছানাটাকে দেখতে পেয়েছিল।

তখনো সত্যিকার পালক গজায় নি। গায়ের চামড়া গোলাপি, তাতে আবার ঠিক যেন হাঁসের গায়ের মতো কাঁটা দিচ্ছে, অল্প অল্প ভিজে মতো লোম। ভারি মজার দেখতে। কাঠুরেদের ছেলেরা কিছুক্ষণ বাচ্চাটাকে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াল। তারপর বোধহয় নিজেদের মা'দের কাছে তাড়া খেয়ে, ফের ঐ ঝাউগাছের গোড়ায় ফেলে রেখে গেল। ওরা ভেবেছিল মা-পাখি বুঝি ছানাদের ঠোঁটে করে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

"কিন্তু একবার যদি ছানার গায়ে মানুষের ছোঁয়ার গন্ধ পায়, কাকের মায়েরা আর তাদের ফিরিয়ে নেয় না। ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে বেচারাদের বাসার বাইরে ফেলে দেয়।"

শুনে কানুর এত দুঃখ হল যে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল। সে বলল, "তখন তোমরা কি করলে নানা?" "কি করলাম? কেন, তোর দাদু ছানাটাকে পকেটে পুরে, ঝাউগাছের মগডালে দাঁড়কাকদের বাসা অবধি উঠে গেল। অমনি বড় কাকগুলো ডানা ঝাপটিয়ে একেবারে তোর দাদুর মুখের উপর তেড়ে এল। দাদু গলা থেকে গলা-বন্ধ খুলে, সেটা নেড়ে ওদের সরিয়ে, বাসার মধ্যে বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখল। তক্ষুণি মা-পাখিটা বেচারাকে ঠেলে বের করে দিল। আরেকটু হলে অতখানি উপর থেকে মাটিতে পড়ে ছানাটা মরেই যেত, ভাগ্যিস্ আমি ধরে ফেললাম! আমার বুড়ো-আঙ্গুলটা পড়ল ওর বুকের উপর, টের পেলাম বুকটা ধুক-পুক করছে। সেই যে ওকে ধরলাম, আর ছাড়লাম না।

বাড়ি নিয়ে গিয়ে বৌকে দিলাম। তার ছেলে-পুলে ছিল না। বললাম, এই নাও, ধর, আর কখনো তোমার একলা লাগবে না। তাই করল বৌ। দেখতে দেখতে দাঁড়কাকের ছানা এই বড়, এই মোটা হয়ে উঠল। তার গা কুচকুচে কালো ও গোছা গোছা পালকে ভরে গেল। চকচকে লালচে চোখ ছিল তার। মুখে তার খই ফুটত!"

"কার বৌয়ের কথা বলছিলে, নানা? সে এখন কোথায়?"

"আমার বৌরে, কানু। সে এখন স্বর্গের রাজা উ-ব্রেইয়ের বাড়িতে আছে। সেখানে সবাই বড় সুখে থাকে। আর সে চলে যাবার পর থেকেই আমিও এই বাড়িটাতে থাকি।"

কানু বলল, "বৌ ভালো না। তোমাকে একা ফেলে চলে গেল।"

"না রে না, সে বড় ভালো ছিল। যাবার সময় আমাকে বলেছিল—

রুনারকে দেখো। পাখিটার নাম রেখেছিলাম রুনার। বাইশ বছর ধরে দেখাশুনো করেছিলাম। তারপর একটা রোদে-ভরা সকালে কোথায় যে উড়ে চলে গেল আর এল না। বৌয়ের সঙ্গে দেখা হলে তাকে কি যে বলব, তাই ভেবে পাচ্ছি না।"

শুনে কানু অবাক হয়ে গেল? "বৌয়ের সঙ্গে আবার দেখা হবে কি করে নানা? তুমি স্বর্গে যাবার রাস্তা জান না কি?"

নানা বিরক্ত হয়ে বলল, "পথ খুব সহজেই খুঁজে বের করা যায়। ঠিক যেমন করে এই পাহাড়ের সব নালা-নদী বড়পানি যাবার রাস্তা খুঁজে পায়। মস্ত নদী বড়পানি দেখিস্ নি, কানু? নিচে নামার মোটর রাস্তার পাশে পাশে কেমন সে ছুটে চলে! যাকগে সে কথা। চল্, আমাদের ছোট নদীতে মাছ ধরি গে, যাই। কাল তো তোদের ছুটি, বাড়ির পড়া করতে হবে না।"

ছিপ আর মাছ রাখার খুদে টুকরি নিয়ে ওরা পুলের দিকে নেমে চলল। এবার আর সিঁড়ি বেয়ে নামা নয়, নানার হাঁটুতে ব্যথা, সে পারবে কেন। ওরা পাক-দণ্ডীর পথ ধরে নামল। কিন্তু নানার যখন বয়স কম ছিল, তখন সে একেবারে সিঁড়ির দুটো ধাপ ডিঙ্গিয়ে, দৌড়ে দৌড়ে উপরে

উঠত। তার উপর পিঠে একটা বোঝা বাঁধা থাকত!

পুলের তলাতেই ওদের মাছ ধরার বিশেষ জায়গাটা। মাথার উপর উইলো গাছের ঝোলা পাতার ছায়া। তলায় রোদ লেগে গরম হওয়া একটা চ্যাপ্টা পাথর। নানার সঙ্গে মস্ত মস্ত পিঁপড়ের ডিম, টের পেলেই মাছগুলো লাফিয়ে ধরতে চায়!

মাছ ধরার কথা সব নানার জানা। এই পাথরে বসে নানা দাদুর সঙ্গে মাছ ধরত। তার অনেক বছর পরে বাপুর সঙ্গেও এখানে মাছ ধরেছে। আজ নানা বলল, "কখনো খুব ছোট মাছ ধরতে নেই। ওরা মাছদের ছেলেমেয়ে। চেয়ে ছাখ্, জলের মধ্যে কেমন ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়! তার চেয়ে বড় মাছ ধরিস্, সেগুলোকে রেঁধে খাওয়া যায়। ছোট মাছগুলোকে আবার জলে ফেলে দে, দাদু।" এই বলে ছোট মাছের গলার ভিতর থেকে সাবধানে বঁড়শীর কাঁটা বের করে দিয়ে, মাছটাকে জলে ছেড়ে দিল।

কানু জানতে চাইল, "তবে কি তুমি সব জানোয়ারদের ভালোবাস নানা? মাছদের, পাখিদের সবাইকে? তুমি কি কেঁচো, শুয়োপোকা, ডানাওয়ালা পোকাদেরো ভালোবাস? সাপদের ভালোবাস নাকি?"

নানা হেসে বলল, "বুঝলি, পোকাদের আর সাপদের একটু দূর থেকে ভালোবাসাই ভালো। লম্বা লম্বা লোমওয়ালা লাল শুঁয়ো পোকাদের লক্ষ্য করেছিস, কেমন সরলগাছ থেকে নেমেই প্রাণপণে ছুট লাগায়? খবরদার, ওদের গায়ে হাত দিস্ নে; দিলে কিন্তু হাতে ওদের লোম ফুটে যাবে, বেজায় জ্বালা করবে। তবে একটু চূণ লাগিয়ে শুকিয়ে নিলে, চূণের সঙ্গে লোমগুলোও খুলে আসে।"

"সাপের কথা বললে না, নানা?"

নানা হাসতে লাগল। "কি আর বলব। ঠাণ্ডা পড়লে ওরা নিরাপদ দেখে গর্ত খুঁজে নিয়ে সারা শীতকালটাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। তখন ওদের বিরক্ত না করলে, কাউকে কিছু বলে না। আমার দাদা একবার পাহাড়ের গা থেকে মস্ত এক পাথর সরিয়ে দেখে কি না, তার পিছনে গভীর গর্তের মধ্যে লম্বা একটা সবুজ সাপ শুয়ে আছে, এতটুকু নড়ছে-চড়ছে না। তার চকচকে নীল চোখ দুটো খোলা রয়েছে, সেগুলোও নড়ছে না। দাদা পাথরটাকে আবার সেই জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল,—বসন্তকাল এলে সাপটা জেগে উঠবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—তবে ওর চোখ

খোলা কেন? দাদা বলল,—সাপের চোখের ঢাকনি থাকে না, তাই বন্ধ করতে পারে না। এ-ও জানিস্ না? জেগে উঠে, গায়ের পুরনো ছালটাকে খুলে ফেলে দিয়ে, নতুন একটা গজিয়ে নেবে। জানিস্, প্রথম প্রথম নতুন ছালটা এমনি নরম থাকে যে ওর এতটুকু নড়তে-চড়তে ইচ্ছা করে না। সেই সময়ে ওকে মেরে ফেলা খুব সহজ।

তাই শুনে আমি বললাম,—তা হলে তাই কর না কেন? দুষ্টু সাপের চামড়া যখন নরম থাকে, তখন ওকে মেরে ফেল না কেন?

দাদা চটে গেল,—কি বললি? শত্রু যখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন তাকে মারতে হবে? ও-রকম করতে হয় না।"

তিন

কোনকালে কোথায় কি হয়েছিল, সারা বিকেল নানা সেই সব গল্প করতে লাগল। আজকাল যা ঘটেছে সে নানার মনে থাকে না; লোকের নাম, জায়গার নাম গুলিয়ে যায়। কিন্তু অনেক দিন আগের ঘটনায় ওর কখনো ভুল হয় না।

গাছের ছায়াগুলো যখন লম্বা হয়ে এল, ওরা ছিপটিপ গুটিয়ে, মাছের চুবড়িটাকে তুলে উঠে পড়ল। চুবড়িতে নানার ধরা পাঁচটা মাঝারি মাছ আর কানুর একটা। কিন্তু সেটাই সব চেয়ে বড়, তাকে ডাঙ্গায় তুলতে

নানা সাহায্য করেছিল। ততক্ষণে বাতাসে একটু শীতের ছোঁয়া লেগেছিল, কিন্তু পাথরগুলো তখনো গরম। নানা হঠাৎ আঙ্গুল দিয়ে উত্তর দিকের দিগন্তে দেখাল। কানু দেখল সেখানে নীল আকাশের গায়ে মিহি খড়ি দিয়ে আঁকা ছবির মতো বরফের পাহাড়। খুব পরিষ্কার দিন না হলে ওগুলো কখনো দেখা যায় না। তাই দেখে উত্তেজনার চোটে কানুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। "ও নানা, ওখানে একদিন যাওয়া যায় না? দাদু কখনো ওখানে যায় নি?"

নানা মাথা নাড়ল। ঐ বরফের পাহাড় যে কয়েক শো কিলোমিটার দূরে, যাবে কি করে? মাঝে আরো কত পাহাড়ের সারি। কাছের পাহাড়গুলোকে সবুজ দেখায় আর দূরের পাহাড় নীল, আবছায়ার মতো। কিন্তু এই পাহাড়ের গায়ে এই তো হাতের গোড়ায় মুলকি। মুলকির বাড়ি, বাগান কি সুন্দর দেখতে। যে-সব জায়গায় রোদ পড়ে, সেখানে বুনো ষ্ট্র-বেরি হয়। পাথরের খাঁজে ছায়া-ছায়া জায়গা থেকে কানু অনেক ছোট ছোট, সাদা রঙের বুনো ভায়োলেট ফুল কুড়লো। কি মিহি মিষ্টি গন্ধ ওদের, মা কত ভালোবাসেন!

ঘোরা পথে বাড়ি পৌঁছতে অনেক বেশি সময় লাগল। নানার হাঁপ ধরে গেলে, দম নেবার জন্য দুবার থামতেও হল। নানা বলল, "পাহাড়ে উঠবার সময় মুখ বন্ধ করে সর্বদা নাক দিয়ে নিশ্বাস নিবি, নইলে হাঁপিয়ে যাবি।" কানু বলল, "তুমি তো হাঁপাচ্ছ।"

নানা খুব হাসল, "আরে, আমার প্রায় আশী বছর বয়স হল, আমি হাঁপালে দোষ হয় না। আমি তো শুধু নৌকো আসার অপেক্ষায় আছি।"

কানু অবাক হয়ে গেল। "আচ্ছা, নানা, এই সব পাহাড়ে নদী বেয়ে কি করে নৌকো আসবে? স্কুলের দিদিমণি বলেছেন ঐ যেখানে সব ছোট নদীগুলো পাহাড় বেয়ে নেমে বড়পানিতে মেশে, তার বেশী নৌকো আসতে পারে না।"

তাই শুনে নানা খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, "তাই নাকি? তা হলে দেখছি আমাকেই বড়পানিতে যেতে হবে।"

"ও নানা, আমিও কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?" নানা বলল, "সে কি! তোর তো মোটে সাত বছর বয়স, নৌকো তোকে নেবে কেন? আমার কথা আলাদা। আমি প্রায় আশী বছর বাঁচলাম, কত দেখলাম,

শিখলাম, কত খাটলাম, কত দুঃখ পেলাম, সুখ পেলাম। আমি বনের দাবানল নিবিয়েছি, বুড়ো গাছ কেটেছি, নতুন গাছ পুঁতেছি। আশা করি এটা তোর জানা আছে যে কেউ যদি একটা গাছ কেটে ফেলে, কিম্বা যদি বুড়ো হয়ে গাছটা মরেই যায়, তাহলে তার জায়গায় একটা চারা গাছ পুঁতে দিতে হয়?"

"কেন, নানা?"

"আরে, তা না হলে যে পাহাড়-পর্বত সব ন্যাড়া হয়ে যাবে। তারপর পাথরের সঙ্গে মাটি বাঁধবার জন্য গাছের শিকড়ও থাকবে না; অমনি ধ্বস নামবে। গাছ কমে গেলে, বৃষ্টিও কম হবে। জায়গাটা রুক্ষ মরুভূমি হয়ে যাবে।"

"তুমি আর কি কি করেছ, নানা?"

"কেন, জানোয়ারদের পোষ মানিয়েছি, বুনো জন্তু মেরেছি।"

"অ্যাঁ! তুমি বাঘ ভাল্লুক মেরেছ নাকি, নানা? ফাঁদ পেতে ধরেছিলে?"
নানার সে কি রাগ! "পুরুষ মানুষরা কি অবোধ প্রাণী ধরবার জন্য কখনো ফাঁদ পাতে? মোটেই পাতে না। শিকারীরা শুধু জানোয়ারের সঙ্গেই লড়াই করে।"

"তা হলে কেন বন-বিভাগের লোকরা লাইকরের রাস্তায় বাঘ ধরবার ফাঁদ বানিয়েছে?"

"ওহো, ওটার কথা বলছিস্ বুঝি? ওটা তো চোর ধরার ফাঁদ; যেসব চোর মুলকির গেরস্থদের ভেড়ার ছানা, মুরগির ছানা, শূকরছানা ধরে নিয়ে যায়, তাদের ধরার জন্য। ওকে কি শিকার করা বলে নাকি?"

কানু বলল, "ফাঁদের ভিতর ছোট্ট একটা ভেড়ার বাচ্চা বেঁধে রাখে। অন্ধকার রাতে ভয় পেয়ে বেচারা মায়ের জন্য কাঁদে। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনেছি নানা। তারপর বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে।"

ভেবেও কানুর চোখে জল এল। নানা আবার রেগে গেল। "আহা! তুই এত বোকা কেন বল্‌তো? তাছাড়া ওগুলো তো ডোরা কাটা সত্যিকার বাঘও নয়, চকরা-বকরা ছাপ দেওয়া চিতা-বাঘ মাত্র। আর এত উঁচু পাহাড়ে সত্যি বাঘ বড় একটা আসে না। মোটেই তারা ভেড়ার বাচ্চাটাকে খায় না। বাচ্চাটার নাগালই পায় না। বাচ্চা বাঁধা থাকে ফাঁদের মধ্যে আলাদা একটা খাঁচায়। চিতা-বাঘ ফাঁদে ঢুকে যেই না

ভেড়ার ছানাকে ধরবার জন্য হুড়কো ধরে টান দেয়, অমনি ফাঁদের দরজাও যায় পড়ে। বাঘ হয় বন্দী। তখন বাপরে! কি তার চেল্লানি! তাই শুনে মুলকির লোকরা বেরিয়ে এসে বাঘকে ধরে ফেলে। ভেড়ার বাচ্চাকেও অমনি খুলে দেওয়া হয়, সেও দুদ্দাড় করে মায়ের কাছে দৌড়য়! বেজায় ভয় পায় বটে, কিন্তু তা ছাড়া ওর কোনো ক্ষতি হয় না। আরে, দাদু, ভয় পেতে না জানলে, মানুষ সাহসী হতে শিখবে কি করে?"

ছোট মুলকি গাঁয়ে এইভাবে দিন কাটত। বর্ষাকালে দিন রাত বৃষ্টি পড়ত। কখনো মুষলধারে, কখনো বা টুপুর-টুপুর। দূরের নীল পাহাড়-গুলো মেঘে ঢেকে যেত। কাছের পাহাড়ের গা বেয়ে কত নতুন নদী-নালা ছুটে নেমে, অন্য ছোট নদীতে পড়ত। তারপর হুড়মুড় করে চলত পাহাড়তলীর বড়পানিতে মিশতে।

মাঝে মাঝে রাত দুপুরে কানুর ঘুম ভাঙত। শুনতে পেত টিনের খাদের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল চুয়ে, টুপ-টাপ করে নিচে কাঠের মেঝের উপর পড়ছে। কানু টের পেত মা উঠে যেখানে জল পড়ছে, সেখানে কলাই করা বড় গামলাটা বসিয়ে দিলেন। আধ-ঘুম অবস্থায় কানু ভাবত গামলায় কেমন জলের ফোঁটারা বাজনা বাজাচ্ছে। গামলায় খানিকটা জল জমে গেলে আওয়াজটাও কমে আসত, কানুও আবার ঘুমিয়ে পড়ত।

সকালে ঘুম ভাঙলে কান্নু দেখত তখনো বৃষ্টি পড়ছে। মার মন খারাপ। নিচের সমান জায়গায় অজয় নদীর তীরের ছোট বাড়িটিতে বুড়ী মায়ের কথা কেবলি মার মনে পড়ছিল। স্কুলের বইয়ের সঙ্গে আরেক জোড়া জুতো জড়িয়ে দিলেন মা। উ-বিনকে সঙ্গে দিলেন, যেন কান্নু পা পিছলে না পড়ে। এই বৃষ্টিতে পথঘাট বড়ই পিছল।

মা বললেন, "এই রকম বৃষ্টি পড়লে, অজয় নদী দুই তীর ভাসিয়ে নেয়।" কান্নু জিজ্ঞাসা করল, "তবে কি দিম্মার বাড়িও ভাসিয়ে নেবে?" "না, কান্নু, আমাদের বাড়িটা উঁচু জায়গায় তৈরি। বান সেখানে পৌঁছয় না।"

কান্নু বলল, "ধানখেতির নদীও তো পাড় ভাসিয়ে নেয়। পার হবার পাথর সব ডুবে যায়। লুমপারিংএ কেউ নদী পার হতে পারে না। কিন্তু নানা বলে, এক ঘণ্টার মধ্যে আবার জল নেমে সব যে যেমন হয়ে যায়। সব নদীর জল গিয়ে বড়পানিতে পড়ে। সেখানে নানার নৌকো আসবে।"

মা ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে দেমাক করে বললেন, "আমাদের গাঁয়ের চার দিকে দিনের পর দিন জল দাঁড়িয়ে থাকে। এমন কি সব্বাইকে নৌকো চেপে যাওয়া-আসা করতে হয়। সবুজ ধান গাছ বাতাস না পেয়ে, যদি সাত দিনের বেশি জলে ডুবে থাকে তবে সব মরে যায়। আমাদের অজয়ের কাছে তোদের ধানখেতির নদীতো একটা নালার মতো!"

কান্নু কিছু বলল না। কারণ সে জানত যে অজয় নদীর জন্য আর মায়ের নিজেদের ছোট সোনালি গ্রামের জন্য মায়ের মন কেমন করে। তবে ধানখেতির নদী কখনো ফসল ডুবিয়ে মেরে ফেলে না। এমন কি, লাইকর পাহাড়ের ধাপে ধাপে যারা চাষবাস করে, তারা ধানখেতির পাহাড়ি নদী থেকে খাল কেটে, ধান গাছের জন্য জল আনে। এখানকার নদীগুলো শস্য ডুবোয় না, বাঁচিয়ে রাখে।

চার

শরৎকালে সাত দিনের জন্য স্কুল বন্ধ থাকত। তখন সকলে চড়িভাতি করতে যেত, সুন্দর সুন্দর ঝরণার ধারে, কিম্বা পাহাড়ের চূড়োয় সরলগাছের বনে। নানার সঙ্গে কানু, ধানখেতির শ্যামকে নিয়ে ঐ সময়ে একদিন লাইকর পীকের কাঠ-গুদাম দেখতে গেল। সেখানকার প্রকাণ্ড গোল করাতগুলো হুস-হুস শব্দ করে সাদা সরলকাঠ কেটে ফেলছিল। চারদিকে মিহি কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছিল। কানু আর শ্যাম সেই গুঁড়ো হাতে করে তুলে, শুঁকে দেখল ঠিক ধূনোর মত গন্ধ!

কাঠ-গুদামের বুড়ো বলল, "কাঠে যে তেল আছে, এ তারি গন্ধ। ঐ তো আসল ধূনো। দেশলাইয়ের কাঠির মতো জ্বলে। এই বড় বড় সরল-গাছগুলো সব তেলে টুপটুপ করছে। মাঝে মাঝে ডালপালার ফোকর ফাটল দিয়ে সেই তেল চুঁয়ে চুঁয়ে বেরিয়ে, জমে শক্ত হয়ে যায়। সরল-গাছের মগডালে দেখনি সোনালি রঙের আঠার টুপলি রোদে কেমন ঝকমক করছে? কাঠের ঐ আঠা দিয়েই তো ধূপ-ধূনো তৈরী হয়।"

নানার বোধহয় খুব মজা লাগছিল। সে বলল, "তা হয়। কিন্তু, দাদু ঐ আঠার জন্যে দাবানলও হয়। সারা শীতকাল ধরে গাছগুলো কেবলি

শুকোতে থাকে। তারপর চোত-মাসে যেই না বাতাস বইতে শুরু করে, শুকনো ডালপালা পরস্পরের গায়ে ঘষে ঘষে অমনি জ্বলে ওঠে। পাহাড়ের ছোটবড় সব জানায়োর দাবানলকে বড় ভয় করে। এই একটা জীবনে কত কি দেখলাম !

দুজনে তখন নামার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"কি জিনিস দেখলে, নানা ?"

"কি জিনিস দেখলাম ? কেন, দেখলাম কেমন বাতাস উঠে আগুনকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। শুকনো বনের ভিতর দিয়ে টাট্টু-ঘোড়ার মতো বেগে আগুন ছুটে চলে। কত কিলোমিটার পুড়ে ছাই হয়। রাতে আকাশটা টকটকে লাল রং ধরে। পাহাড়ের যত গাঁ থেকে লোকরা বেরিয়ে এসে বন-বিভাগের চৌকিদারদের আগুন নেবাতে সাহায্যও করে।"

শ্যাম এই পাহাড়ে নতুন এসেছিল। সে কখনও বড় দাবানল দেখে নি তাকে দেখে মনে হল বেজায় ভয় পেয়েছে। জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "তবে কি গাঁয়ের লোকেরা সবাই পুড়ে মরে যায়, নানা ? দমকল এসে কেন আগুন নিবিয়ে দেয় না ?"

কানু কখনো দমকলের কথা শোনে নি। এবার সে বলল, "দূর বোকা, গাঁয়ের লোকেরা আর বনের চৌকিদাররা মিলে আগুন নিবিয়ে দেয়। গাছ থেকে কাঁচা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে আগুন নেবায়।"

কাঠ-গুদামের বুড়ো বলল, "ঠিক তাই। এখানে ঐ রকম করেই আগুন নেবানো হয়। দমকল যে আসবে, তার রাস্তা কই ? পাম্প করে যে আগুন নেবাবে, তার পাইপ ভরা জল কই ? না, বাবা, আমরা নিজেদের আগুন নিজেরাই নেবাই। তাছাড়া ফায়ার-লাইন আছে।"

শ্যাম অবিশ্যি পাহাড়ের গায়ে ফায়ার লাইন দেখেছিল, কিন্তু সেগুলোর কি কাজ, সেটা জানত না।

নানা বুঝিয়ে বলল, "সামনের ঐ পথের বাঁক থেকে লুমপারিংএর ফায়ার-লাইন দেখা যায়। চওড়া এক ফালি ন্যাড়া জমি, পাহাড়ের পা থেকে চূড়োয় উঠে, আবার ওদিক দিয়ে নেমে গেছে। ওর জন্যই লুমপারিংএর বাড়িগুলো পর্যন্ত আগুন পৌছতে পারে না। এপারে এসে ঠেকে যায়। ঐ ন্যাড়া জমির ফালি এতটা চওড়া যে এপারের আগুন লাফিয়ে ওপারে যেতে পারে না। ওর উপর ঝোপ-ঝাপ গাছ-গাছলা কিচ্ছু গজাতে দেওয়া হয় না,

তাই গাছ থেকে গাছে ধরেও আগুন আর এগুতে পারে না। ঐ ন্যাড়া জমির ধারে এসে আগুন থেমে যায়। তারপর জ্বলে জ্বলে এক সময় নিবেও যায় ও বাড়িগুলো বেঁচে যায়।"

সেকালের কত দাবানলের কথা মনে করে, নানা মাথা নাড়তে লাগল। "অনেক সময়ই আমাদের মতো যারা চড়িভাতি করতে আসে, তারাই দাবানল লাগিয়ে দেয়। হয়তো কেউ শুকনো ঘাস-পাতার উপর একটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ফেলে দিল। ব্যস্, আর দেখতে হল না, অমনি ঘাস-পাতা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল! মাঝে মাঝে চায়ের জল ফুটোবার জন্য লোকে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালে। আশপাশের শুকনো ডালপালায় সেই আগুন লেগে যায়। হামেশাই এই রকম হয়; লোকগুলোর তো আর কাণ্ডজ্ঞান নেই!

দাবানল বড় সাংঘাতিক জিনিস, দাদু। আমি নিজের চোখে দেখেছি। বনের জন্তুগুলো ভয়ের চোটে ক্ষেপে গিয়ে এক সঙ্গে হুড়মুড় করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। বাঘ হরিণ এক সঙ্গে। কেউ কাউকে কিছু বলে না। এবার অন্য কথা বলা যাক—দাবানলের কথায় মনটা খারাপ হয়ে যায়।"

সেখান থেকে ওরা রোপওয়ে দেখতে গেল। পাহাড়ের চূড়োয় কাঠ-গুদাম থেকে, থামের উপরে বাঁধা মোটা তারের দড়ি বেয়ে, চোখের নিমেষে কেমন কাটা গুঁড়ি আর তক্তাগুলো, পাহাড়ের নিচের গুদামঘরে পৌঁছে যেত! তারের পাকানো দড়িগুলো কি মোটা! ঐ দড়ি বেয়ে কাঠ-বোঝাই ট্রলিগুলো হুড়-হুড় করে নেমে আসত। ঐ উঁচু পাহাড়ে বিজলির ব্যবস্থা ছিল না। ঐ ভারি ট্রলিগুলো শুধু মাধ্যাকর্ষণের টানেই নেমে আসত। নিচের গুদামে পৌঁছলে ট্রলি থেকে মাল খালাস করা হত। তারপর শিকলের সাহায্যে খালি ট্রলিগুলোকে আবার টেনে পাহাড়ের উপরে তোলা হত।

বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে ওরা পাথরের ছায়া-ছায়া খাঁজ থেকে মেডেন-হেয়ার ফার্ণ আর সুন্দর সিল্‌ভার ফার্ণ তুলে আনল। হাতের পিঠে চেপে ধরলে সিল্‌ভারফার্ণের কেমন সাদা ছাপ ওঠে। তাছাড়া ওরা হানি-সাক্‌ল্ লতা জড়ো করে আনল। ফুলগুলির রং ফিকে ঘিয়ের মতো, বেশ ছোট ছোট; কিন্তু এমনি তার সুগন্ধ যে পথের লোকের নাকে গেলে, তারা চমকিয়ে ওঠে! কোথা থেকে এমন সুগন্ধ আসছে খুঁজে বের না করে তারা ছাড়ে না।

কোলভরা বনের ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরল ওরা। বাড়ি পৌঁছে কানু সেসব মায়ের কোলে ফেলে দিল। শ্যাম তার ফুল পাতা নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড় দিল। নাকের কাঁছে হানি-সাক্‌ল্ ফুল ধরে মা একসঙ্গে হাসতে-কাঁদতে লাগলেন।

বললেন, "ওরে কানু, এ যে ঠিক আমাদের সেই ভুঁই-চাঁপা ফুলের মতো। আমার বাবা একবার বর্মার সেগুন গাছের ঘন বনের মধ্যে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা কড়া সুগন্ধ তাঁর নাকে এল। চারদিকে খুঁজে দেখেন প্রকাণ্ড একটা গাছের শেকড়ের কাছে এক গোছা চিকণ সুন্দর সাদা ফুল। গায়ে তাদের বেগুনি দাগ আঁকা। সবুজ ডাল পাতা কিছু নেই। সোজা মাটি থেকে ফুটে উঠেছে কি সুন্দর সব ফুল, যেন মোম দিয়ে তৈরি!"

কানু বলল, "ও মা, দাদু সেগুলোকে বাড়ি নিয়ে আসেন নি?"

"এনেছিলেন বৈকি, বাবা। আমার মায়ের জন্য এক তোড়া ফুল। শুধু তাই নয়, মাটি খুঁড়ে, ছোট ছোট মোটা মোটা আকার মতো শিকড় সুদ্ধ এনেছিলেন। আমাদের বাগানে আম গাছের গোড়ায় ওগুলো লাগানো হয়েছিল। মনে আছে ছোটবেলায় ও ফুল আমিও দেখেছি।

প্রত্যেক বছর শীতকালে ফুল ফুটত। ফুল শুকিয়ে গেলে মাটির উপরে পাতা, বোঁটা কিছু থাকত না। তারপর লম্বা লম্বা সবুজ রঙের পাতার কুঁড়ি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসত। কুঁড়ি খুলে গিয়ে চওড়া চওড়া পাতা দেখা দিত। শরৎকালে পাতা শুকিয়ে যেত। তার অল্প দিন পরেই ফিকে সবুজ ফুলের কুঁড়ি দেখা দিত। এখানে আসবার সময় কয়েকটা শিকড় এনে পুঁতে দিয়েছিলাম কিন্তু ঠাণ্ডায় সেগুলো মরে গেল।"

শুনে কানুর খুব দুঃখ হল। "ওগুলো এখানে না আনলেই হত, মা। আর আনলেই যদি তো বুড়ো হোলডার সাহেবকে দিলে না কেন? উনি বেশ ওঁর বাগানে কাঁচের ঘরে রাখতেন। এই হানি-সাক্‌ল্ আমাদের বাগানেই হবে, মা।"

মা বললেন, "আমি জানি, বাবা।" এই বলে শোবার ঘরের জানলার নিচে লাগাবেন বলে লতাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তা হলে সারা দিন তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে।

পাঁচ

এর পরে এক রাতে মহা গণ্ডগোল। মুলকির কেউ এক দণ্ডও ঘুমোতে পারল না। কি, না, ফাঁদে চিতাবাঘ পড়েছে! সে কি হাউমাউ ফ্যাস্-ফোঁস। নিজের কানে না শুনলে কারো বিশ্বাস হবার কথা নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের গরম বিছানা ছেড়ে বাঘ দেখতে চলল। কানুও গেল নানার সঙ্গে। যদিও মা খুব খুসি হলেন না।

বাঁশের মশালের আলোয় কানু দেখতে পেল, সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ চিতা-বাঘ কাঠের ফাঁদের মজবুৎ দেয়াল নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে আর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। মশালের আলোয় বাঘের চোখ দুটো অদ্ভুতভাবে জ্বলছিল। বাঘ নয়, বাঘিনী, বেশ বড় বাঘিনী।
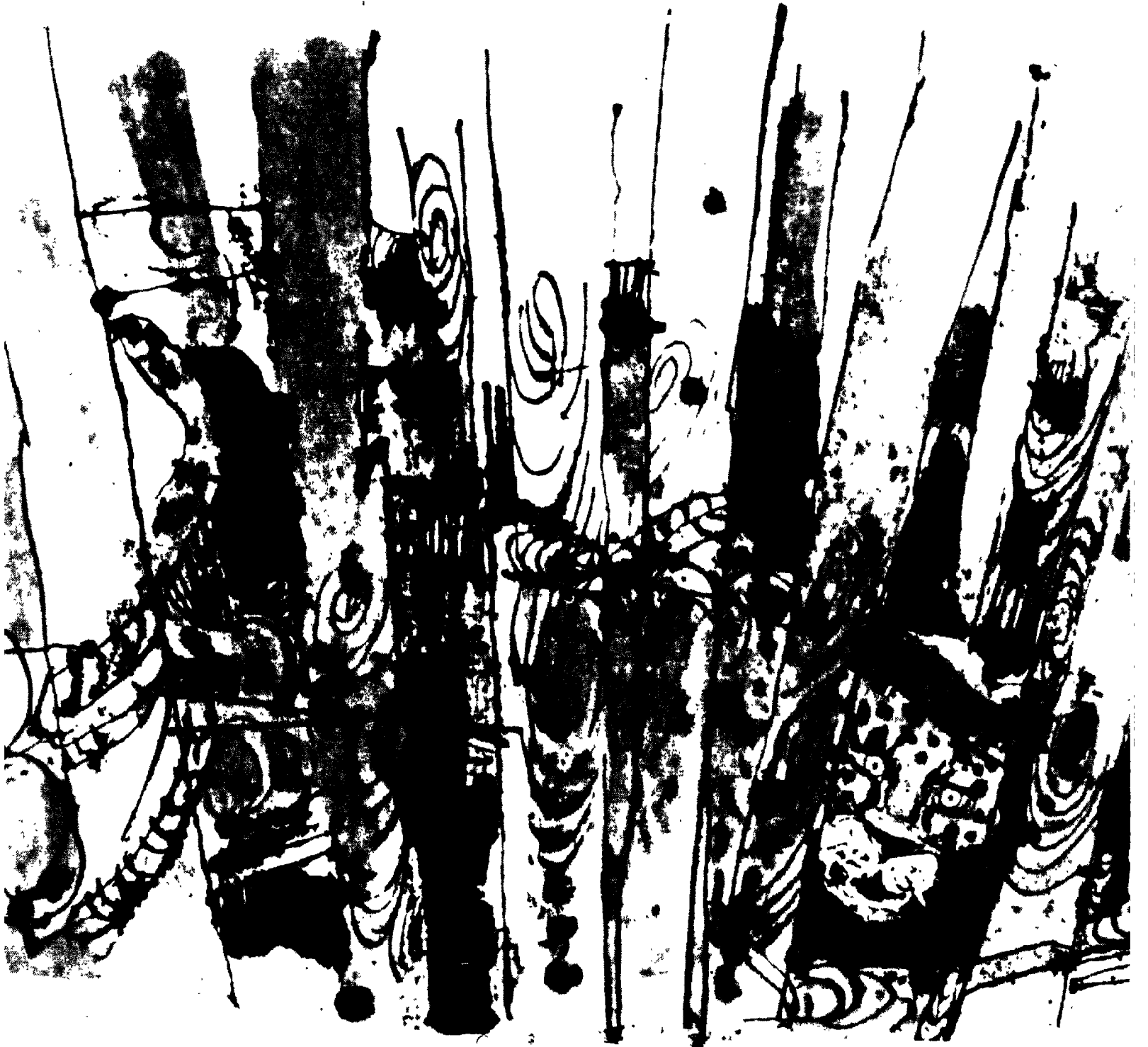
কানু চারদিকে তাকিয়ে ভেড়ার বাচ্চাটাকে খুঁজতে লাগল। তার দেখা নেই। নানাকে জিজ্ঞাসা করাতে, নানা হেসে বলল, "সে কি আর বাঘের কি হল দেখবার জন্য বসে থাকে নাকি!"

"সে কি! বাঘটাকে মেরে ফেলা হবে না তো?"

চৌকিদারদের মধ্যে একজন বলল, "আরে না রে না, ওকে চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে। কি খাসা জানোয়ার, দেখেছ!"

নানার মুখ গম্ভীর হল।

"তোমরা বরং চারিদিকে নজর রেখ। বলা যায় না, আশেপাশে কোথাও হয়তো ও বাচ্চা রেখে এসেছে।"

কানুর সে কি উৎসাহ! "বাচ্চা, নানা? কোথায় রেখে এসেছে?" এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে, নানা কানুকে তাড়া দিয়ে বাড়ি নিয়ে চলল। এখন আর কেন, তামাশা তো ফুরিয়েছে।

তবু সে রাতে কেউ ঘুমোতে পারল না। বাঘটা কিছুতেই চুপ করল না। ওকে মুরগি খেতে দেওয়া হল, দুধে ভিজিয়ে রুটি দেওয়া হল, কিন্তু কিছুতেই তাকে ঠাণ্ডা করা গেল না।

কানু বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁপতে লাগল। বনের জানোয়ারকে খাঁচায়

বন্ধ করে রাখা কি নিষ্ঠুর! বিশেষ করে যদি জঙ্গলের মধ্যে তার ছোট ছোট বাচ্চা পড়ে থাকে! এখন কে তাদের দেখবে?

এর দু'-দিন পরে, বনের ধারে নানা দুটো অদ্ভুত বেড়াল-ছানা কুড়িয়ে পেল। গোবদা-গাবদা, সারা গায়ে লোম, সোনালি চোখ, ঘি রঙের গা, তাতে আবার ফিকে ছাই রঙের দাগ কাটা। ছানা দুটো মিউ-মিউ করে ডাকছিল, গলার মধ্যে গর-র গর-র করছিল, সরলগাছের লম্বা লম্বা শুকনো পাতার উপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। নানা তাদের তুলে বাড়ি নিয়ে এল। কি মিষ্টি বাচ্চা দুটো সে আর বলা যায় না। মা তাদের কোলে বসিয়ে, মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। তারপর বাটি ভরে তাদের দুধ খেতে দিলেন। তারা বাটি উল্টিয়ে সব ফেলে দিল। তখন মা কানুর ছোটবেলাকার দুধের বোতলটা বের করে, বাচ্চা দুটোকে পালা করে খাওয়ালেন। হাঁচড়-পাঁচড় চকর-চকর করে তাদের দুধ খাওয়া দেখে কানু হেসে কুটোপাটি!

এক ভৌ-ভৌ আর মিয়াও ছাড়া বাড়ি সুদ্ধ সকলের ভারি মজা লাগল। ওদের দুজনকে কিন্তু রান্নাঘরে বেঁধে রাখতে হল। সেখানে তারা রাগের চোটে গায়ের লোম ফুলিয়ে, ফ্যাস ফোঁস করতে লাগল। মা বললেন, "সব জানোয়ার অচেনা কাউকে দেখতে পারে না, যতদিন না তাদের সঙ্গে চেনাশোনা হয়ে যায়। এ বেড়াল বাচ্চাগুলো কিন্তু কি রকম যেন আলাদা ধরণের দেখতে।"

দরজার কাছ থেকে নানা বলল, "ওরা তো বেড়ালের বাচ্চা নয়। ওরা চিতাবাঘের বাচ্চা। রাখতে চাও নাকি মা ওদের?"

ততক্ষণে বসবার ঘরের আগুনের সামনে পাতা কম্বলের উপর বাচ্চা দুটো দলা পাকিয়ে ঘুমিয়ে কাদা। দেখাচ্ছিল ঠিক যেন দুটো পশমের গুলি। মা একটু চমকে উঠলেন।

"এবার বুঝলাম মা—চিতা কেন সারা রাত ওরকম চেঁচামেচি করেছিল। বেশ তো, যত দিন না বন-বিভাগের কর্মচারীরা মায়ের কাছে ওদের পাঠাবার বন্দোবস্ত করছেন, ততদিন থাকুক এখানে।"

শুনে কানুর মহা দুঃখ। "আচ্ছা মা, চিড়িয়াখানায় পাঠালে তো খাঁচায় বন্ধ হয়ে থাকতে হবে। তার চেয়ে এখানেই রাখা যায় না?"

লাইকর গ্রাম থেকে বুড়ো গোয়ালা রোজ সকালে লম্বা বাঁশের চোঙে

করে চমৎকার সোনালি রঙের দুধ নিয়ে আসত ; সে আঁৎকে উঠল। "সে কি কথা! বাড়ির মধ্যে চিতাবাঘের ছানা পুষবে! তুমি কি এও জান না যে বনের জানোয়ার কখনো পোষ মানে না? অনেক বছর আগে বনে দাবানল লেগেছিল। তার মধ্যিখানে ছোট্ট একটা বেড়ালছানা পেলাম। তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বড় করলাম। ক্রমেই সে বড় হতে লাগল আর তার খাওয়ার মাপও বাড়তে লাগল। আমার বৌ আর বুড়ি মা কি যে করবে ভেবে পেত না। কিন্তু বাচ্চাটার ধরণ-ধারণ এমনি মিষ্টি যে সবাই তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তারপর তার গায়ে হলুদ রং ধরল, তার উপর বড় বড় ছাই রঙের চাকা দেখা দিল, তখন আর তাকে চিনতে কারো বাকি রইল না।

শেষে একদিন সকালে আমার বৌয়ের পোষা মুরগিটাকে সে হাড়গোড় পালক-টালক সুদ্ধ চিবিয়ে গিলে ফেলল! বৌ তো মহা খাপ্পা। রেগেমেগে সারা রাত তাকে উঠোনে বেঁধে রেখে দিল। পর দিন সকালে
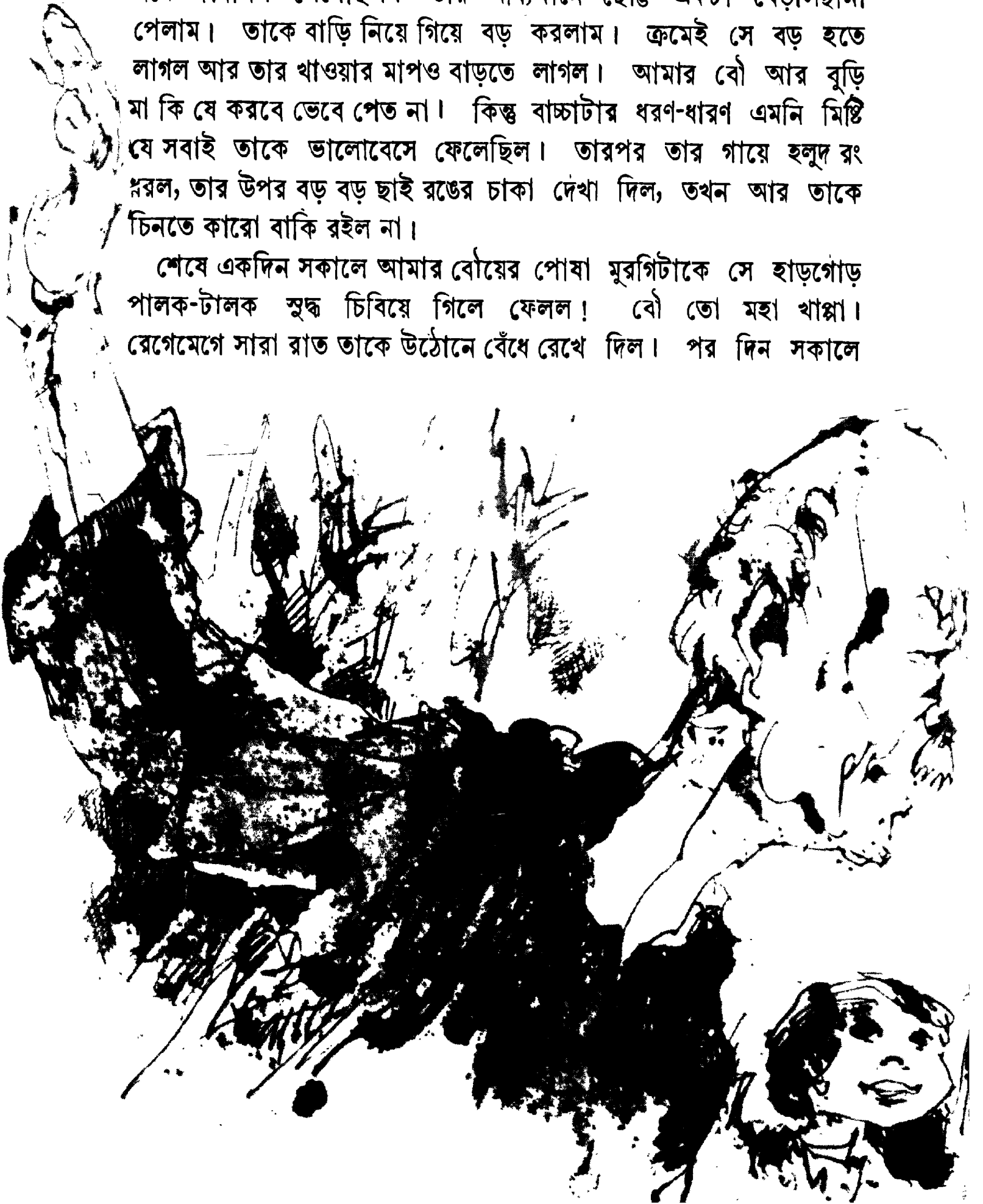
উঠে সকলের ভারি মন খারাপ। তাড়াতাড়ি গেলাম বেচারিকে ছেড়ে দিতে। গিয়ে দেখি কোথায় কি! রাতে কখন দড়িটাকে কামড়িয়ে ছিঁড়ে সে হাওয়া হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমাদের নতুন ভেড়ার ছানাটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। দুজনার ল্যাজের ডগাটিও আর কখনো দেখা গেল না। বললাম না, বুনো জন্তু কখনো সত্যিকারের পোষ মানে না।"

বন-বিভাগের লোকরা চিতাবাঘের বাচ্চা দুটোকে তাদের মায়ের কাছে নিয়ে যাবার পর কানুর কি দুঃখ। তাকে ভোলাবার জন্য নানা ঝাউগাছের মগডালে প্রকাণ্ড বোলতার চাকটা দেখিয়েছিল। চাকটা দেখতে একটা মস্ত মেটে রঙের বলের মতো, তবে ঠিক গোল নয়, একটু লম্বাটে। রোজ চাকটা একটু করে বড় হতে লাগল। কানুর চোখে পড়ল যে গাছের নিচে মাটির উপর চাক থেকে চুঁয়ে কয়েক ফোঁটা পাৎলা মধু পড়ত আর তার চার দিকে বড় বড় কালো পিঁপড়ে জড়ো হত।

পরে এক দিন উ-বিনকে বোলতায় হুল ফুটিয়ে দিল। তাই দেখে বুড়ো গয়লা মার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিল যে আর কিছুদিন বাদে এ বাড়িতে

কেউ বাস করতে পারবে না। চাকটাতে আগুন লাগিয়ে পেড়ে ফেলা দরকার। তাই শুনে নানা বেজায় চটে গেল। বোলতাদের বিরক্ত না করলে তারা কখনো কারো অনিষ্ট করে না। ঐ ঝাউগাছের ডালে উ-বিন কেন কাপড় শুকোবার দড়ি বাঁধতে গিয়েছিল ?

সে দিন অনেক রাতে, মাকে বলে উ-বিন ওদের গাঁ থেকে কয়েকজন লোক নিয়ে এল। বাঁশ দিয়ে একটা মশাল তৈরি হল। আরেকটা লম্বা বাঁশের আগায় সেটাকে বাঁধা হল। তারপর ঐ মশাল জ্বেলে বোলতার চাকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। মোমে ভরা চাক, দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। বোলতারা বেরিয়ে এসে অন্ধকারে অন্ধের মতো উড়ে বেড়াতে লাগল। কারো কারো ডানা জ্বলে যাওয়াতে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর চাকটাও জ্বলতে জ্বলতে নিচে পড়ল। গাঁয়ের লোকরা আগুন নিবিয়ে, চাক নিয়ে চলে গেল। কানু খুব কাঁদল, দুধ খেল না।

নানা বকতে লাগল। বলল, সেবার যে পিঁপড়ের গর্তে জল ঢেলে কানু পিঁপড়েদের দলে দলে পড়ি-মরি করে ছুটে বেরিয়ে আসা দেখছিল, তখন কত পিঁপড়ে ডুবে মরেছিল, সে কথা কি কানুর মনে নেই ? তাই শুনে পিঁপড়ে বেচারাদের দুঃখে কানু আরো খানিকটা কেঁদে নিল। নানারও যে মন খারাপ হয়ে গেছে, সেটা কানু বুঝতে পেরেছিল।

কানু বলল, "মাকড়সারা দুষ্টু, ড্র্যাগন-ফ্লাইদের ধরে খায়। পাখিরা দুষ্টু প্রজাপতি ধরে খায়।"

নানা বলল, "ছোট ছেলেরাও ওদের মতোই দুষ্টু। তারা ছোটমাছ বেচারিদের ধরে খায়, মুরগি খায়, ভেড়ার ছানা খায়। বুঝলি দাদু, এই পৃথিবীতে সারাক্ষণ কেউ না কেউ আর কাউকে খেয়ে ফেলছে। এবার লক্ষ্মী হয়ে দুধ খেয়ে, ঘুমিয়ে পড় দিকিনি।"

ছয়

অনেক দিন ধরে কানুর চিতাবাঘের বাচ্চা দুটোর জন্য মন কেমন করত। এদিকে ভৌ-ভৌ আর মিয়াও কিন্তু মহা খুসি। ওরা দুজন বাড়ির সব ঘরে দৌড়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াতে লাগল। সে-সব ঘরের কোণায় বাচ্চা দুটো থাকত, সেখানে কি শোঁকা-শুঁকির ধুম! মা বুঝতেন কানুর মন কেমন করে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "১২ নং সার্ভে পার্টি কেমন করে গারো পাহাড়ে বাচ্চা হাতি ধরেছিল, সে-গল্প কি তোকে বলেছি?" গল্পের গন্ধ পেয়েই কানু কাছে এসে বসল। "কই, না তো। তারপর কি হল? বাচ্চাটা এখন কোথায়?"

মা বললেন, "আশা করছি নিশ্চিন্তে নিরাপদে কোথাও খুব খাটছে। হাতির এত দাম যে যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানকার লোকরা ওদের খুব যত্ন করে।"

১২ নং সার্ভে পার্টি ছিল বাপুর নিজের পার্টি। কানু জানতে চাইল, "বাপু বাচ্চাটাকে দেখেছিল?" "নিশ্চয় দেখেছিল। আসলে ওরা বাচ্চা হাতি ধরতে যায় নি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাহাড় নদীর মাপ নেওয়াই ছিল ওদের কাজ। এদিকে লোকরা রোজ বলতে আরম্ভ করল যে কাজ সেরে সন্ধ্যেবেলায় ক্যাম্পে ফেরার সময় নাকি একটা সাংঘাতিক হাতি ওদের তাড়া করে।

বাপু ওদের জিজ্ঞাসা করলেন, "হাতির দল তোমাদের তাড়া করে, নাকি শুধু একটা হাতি?"

"একটা হাতি, সাহেব, দল-টল তো কখনো দেখিনি।" জরিপ বিভাগের সবাই জানত যে অনেক সময়ই একটা হাতি মানেই পাগলা হাতি, অর্থাৎ খুবই বিপজ্জনক।

তখন থেকে তারা একলা একলা যাওয়া আসা না করে, খুব সাবধানে এক সঙ্গে দু-তিন জন করে চলা-ফেরা করতে লাগল। তাদের সঙ্গে বড় বড় বন্দুক থাকত।

তার পরদিন যেই না হাতিটা আবার কয়েকজনকে তাড়া করল, ওরাও গুলি করে বেচারিকে মেরে ফেলল। পথ থেকে গড়িয়ে মরা হাতিটা খাদের নিচে পড়ল।

তার পরদিন সকালে ওদিক দিয়ে যাবার সময় লোকজনরা আবার হাতির শব্দ শুনে অবাক হয়ে গেল। খবর পেয়ে বাপু কয়েকজন লোক নিয়ে খাদের নিচে নেমে দেখে একটা বাচ্চা হাতি তার মরা মাকে শুঁড় দিয়ে ঠেলে তুলবার চেষ্টা করছে। বাচ্চাটার একটা পায়ে চোট লেগে থাকবে, একটু খুঁড়িয়ে চলছিল।

বাপু বুঝতে পারল বেচারি মা হাতি নিশ্চয় ভেবেছিল যে জরিপের লোকরা ওর খোঁড়া বাচ্চার কোনো অনিষ্ট করতে এসেছে, তাই ওদের দিকে তেড়ে যেত। ব্যাপার বুঝে সকলের যা দুঃখ। ওরা বাচ্চাটার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, তাকে কচি কচি আখ চিবুতে দিল। পরে তাকে সঙ্গে করে ক্যাম্পে নিয়ে এল। সেখানে ত'কে ট্রেনিং দেওয়া হল।

গোড়ার দিকে বাচ্চাটার বেজায় কাতুকুতু লাগত, গায়ে কেউ হাত দিলেই চিড়বিড় করে উঠত। কাতুকুতু সারাবার জন্যে ওকে দলাই-মলাই করা হত। বাপুর কাছে শুনেছি প্রথম প্রথম বাচ্চাটা কিলমিল ছটফট করত আর ঠিক মনে হত যেন হেসে একাকার হচ্ছে। আস্তে আস্তে কাতুকুতু সেরে গেল, তখন সে অনায়াসে ছোট ছোট বোঝা পিঠে নিয়ে বেড়াতে পারত।

বাচ্চাটা এমনি মজা করে বেড়াত যে সবাই ওকে ভালোবাসত। কেউ হয়তো একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বাচ্চাটা করত কি, পা টিপে টিপে ঝোপের পিছন থেকে এসে তাকে ঠেলে ফেলে দিত। ঐ অত বড় হাতিরা যে কি রকম নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে, দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। ওরা হাতিটার নাম রেখেছিল রঘুবীর। এখনো সে জরিপ বিভাগের লোকদের কাছে আছে।"

গল্পের শেষটা ভালো হলেও, বেচারা মা-হাতিটার কথা ভেবে কানুর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে তো শুধু নিজের বাচ্চাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। শুনে নানা বলল, "হ্যাঁ, তা সত্যি, কিন্তু সেই সঙ্গে জরিপের লোকদের মেরে ফেলার চেষ্টাও করছিল, সেটা ভুলে যেও না। এবার আমি তোমাকে একটা মুখপোড়া হনুমানের বাচ্চার গল্প বলছি।

ব্যাপারটা হয়েছিল বাণারসে। এই পাহাড় থেকে একদল তীর্থযাত্রী সেখানে গিয়েছিল। আমার মা-ও তাদের সঙ্গে ছিল। বাণারসের নাম কাশী। এখানকার সবাই কাশীর রাস্তার ভিড়ের ঠেলাঠেলি, গঙ্গার ঘাটের হাজার

হাজার পাথরের সিঁড়ি, শত শত নৌকো আর এত অল্প দামে এত ভালো ভালো ক্ষীরের মিষ্টি দেখে একেবারে হাঁ হয়ে গেল !

যা কিছু দেখবার জায়গা ছিল, সারাদিন তারা তা দেখে বেড়াত। যা দেখত তাদের প্রায় সব ভালো লাগত, কিন্তু একটি জিনিস বাদে—কালো-মুখ হনুমানের দল। যেখানে সেখানে সব জায়গায় তাদের ভিড়। অনেক বাড়ির উঠোনের উপরেও জালের ছাদ, যাতে হনুমানগুলো উপদ্রব

করতে না পারে। তবে হনুমান কেউ মারত না, তাদের সবাই পরম পবিত্র জানোয়ার বলে মনে করত। সেকালের রামের ভক্ত।

এদিকে হনুমানগুলো গাছ থেকে ফল চুরি করত; কাপড় শুকোতে দিলে সব নিয়ে পালাত। ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাত। আর শুধু কি তাই, মনে হত এই সব দুষ্টুমি করে তারা খুব মজা পাচ্ছে! আমার মা আর অন্য তীর্থযাত্রীরা সবাই হনুমান দেখলেই বেজায় ভয় পেত।

একদিন সকালে সবার কানে গেল একটা বিকট হাউ-মাউ চেঁচামেচি। কি ব্যাপার, না, হনুমানরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। মা আর অন্য মেয়েরা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাবে, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড মা-হনুমান এক লাফে তাদের কাছে এসে হাজির হল। এক নিমেষের মধ্যে মায়ের কোলে তার বাচ্চাটা ঠুসে দিয়ে মা-হনুমান বাড়ির পাঁচিল টপকে হাওয়া হয়ে গেল।

বাচ্চাটা কিন্তু ভারি মিষ্টি, হয়তো মাসখানেক এত ছোট বাচ্চা যে তখনো খেতে শেখেনি। তবে দুধের বাটিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে দিলে, সেটি চুষে চুষে খেল। সবাই তাকে

কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়, মা হঠাৎ অবাক হয়ে দেখে দোর গোড়ায় মা-হনুমানটা দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দুটি জোড় করা, ঠিক যেন মানুষের মতো। মা তখন বাচ্চাটাকে এনে তার কোলে দিতেই, আবার পাঁচিল টপকিয়ে চলে গেল। বাচ্চাটা তার গা আঁকড়িয়ে ঝুলে রইল।

"কেন এমন হল, নানা?"

"আরে, এ-ও জানিস্ না বুঝি যে অনেক সময় হিংস্র পুরুষ জানোয়াররা ছোট বাচ্চাদের আক্রমণ করে? কিম্বা হয়তো হনুমানের দলটাকেই শত্রুরা আক্রমণ করেছিল। সে যাই হোকগে, মোট কথা মা-হনুমান জানত যে মেয়েদের কাছে তার বাচ্চা নিরাপদে থাকবে। কেমন, এ গল্পটা ভালো না?

কানু বলল, "হ্যাঁ, খুব ভালো।" এই বলে সে নিজের মায়ের কোল ঘেঁষে শুতে চলে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগল যে মায়েরা বড় ভালো হয়।

সাত

বছর যেমন শেষ হয়ে আসতে লাগল, দিনগুলোও তেমনি ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করল। বাতাসটা যেন ফটিকের মতো পরিষ্কার। রাতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হত যেন বিশাল একটা গামলা কে উপুড় করে রেখেছে। তার রং গাঢ় বেগুনি; তার গা-ময় তারা বসানো। মা কানুকে গ্রহগুলো দেখিয়ে দিলেন। গ্রহদের নিজের আলো নেই; সূর্যের আলো পড়ে সেগুলো স্থির ভাবে জ্বলতে থাকে। তারাদের নিজের আলো; মনের আনন্দে তারা কেমন মিট মিট করে জ্বলে। মা বললেন, "আসলে ওরাও এক একটি সূর্য। ওদের নিজেদের সব গ্রহ আছে।"

কানু জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মা, তুমি যখন ছোট ছিলে, তোমাদের সোনালি গাঁ থেকেও কি এগুলোকে দেখতে পেতে?" মার গলার স্বরে কেমন একটা ভাবের ঘোর লেগে গেল। মা বললেন, "হ্যাঁ, বাবা, সেখান থেকেও এই একই গ্রহ তারা দেখতাম। ব্যাপারটা কি অদ্ভুত আর চমৎকার একবার ভেবে দেখিস্। ঠিক এই সময় হয়তো আমার বুড়ো মা-ও এই গ্রহ তারার দিকে তাকিয়ে, আমাদের কথাই ভাবছেন।"

"আচ্ছা, মা, সমস্ত পৃথিবীতে সব্বাই কি একই তারা দেখতে পায়?"

"না, কানু, পৃথিবীর উত্তর দিকের আধখানার লোকরা অন্য তারা দেখে। দক্ষিণ দিকের লোকরা অন্য তারা দেখতে পায়। জানিস্, আমাদের গাঁ থেকে আকাশটাকে ঘন নীল দেখায়, এখানকার মতো গাঢ় বেগুনি নয়। ঐ যে আকাশের এপার থেকে ওপার একটা চওড়া সাদা পথের মতো দেখছিস্, ওটাকে ছায়া-পথ বলে। ওটা লক্ষ লক্ষ তারা দিয়ে তৈরি। আমরা ওটাকে বলতাম আকাশ-গঙ্গা।"

কানু আশ্চর্য হয়ে বলল, "সব জায়গায়, সব জিনিসই এক রকম, না, মা?" মা বললেন, "হ্যাঁ, বাবা।" "তবে কেন তোমার মুলকির চেয়ে সোনালিকে বেশি ভালো লাগে?" "আমি যে ঐখানে জন্মেছিলাম বাবা, আমার মা যে ওখানে আছে।" "তাহলে কি সোনালির জন্য তোমার মন কেমন করে, নাকি তোমার মায়ের জন্য?" মা বললেন, "না, তুই বড্ড বেশি কথা বলিস্।" কিন্তু তাঁর ঠোঁটে একটু হাসি দেখা গেল।

যখন আরো শীত পড়ল, তখন গাছ থেকে পাতা ঝরতে আরম্ভ করল।

প্রথমে সবুজ পাতাগুলো হলদে হয়ে গেল, তারপরে তাতে একটু মেটে রঙের ছোপ ধরল, তারপর একটু উত্তুরে বাতাস বইতেই পাতাগুলো খসে পড়তে লাগল। পাতাগুলো ভেসে ভেসে মাটিতে পড়ে গাছের নিচে জমা হতে লাগল। কি তাদের রং—হলদে, পাটকিলে, সোনালি, টুকটুকে লাল, এমন কি কালোও।

কানুদের মালি উ-বিন তার মস্ত বড় কাঁটা দিয়ে আঁচড়িয়ে পাতাগুলোকে ছোট ছোট ঢিপি করে জড়ো করে রাখত। তাহলে বাগানটা দেখতে খুব পরিপাটি হবে। তারপর ছোট ঢিপিগুলোকে এক সঙ্গে মিলিয়ে, বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা বড় ঢিপি বানাত।

তারপর নানা এসে ডাক দিত, "চল দাদু, এবার পাতা জ্বালানো হবে।" সূর্য ডুবলে উ-বিন এসে শুকনো পাতার ঢিপিতে আগুন ধরিয়ে দিত। অমনি সেটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠত। ইংরিজিতে একেই বলে বন্-ফায়ার। আগুনের শিখাগুলো বাড়ির লাল ছাদের সমান উঁচু হয়ে উঠত। গাছের দাঁড়কাকরা ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে অন্ধকার আকাশে হেঁড়ে গলায় ডাকতে ডাকতে উড়ে পড়ত।

নানার কি হাসি। কানু বলল, "ওরা বোধহয় ভেবেছে এরি মধ্যে সকাল হয়ে গেছে। না, নানা?" নানা বলল, "না রে, ওরা ভেবেছে জঙ্গলে আগুন লেগে গেছে।" তাই শুনে মার ভয় হল। "ঝোপে আগুন লেগে যাবে না তো, কাকাবাবু?"

নানা বলল, "না মা, না। ঐ তো উ-বিন তার কাঁটা আর মস্ত এক বালতি জল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগুনের হল্‌কা একটু এদিক-ওদিক গেলেই ও নিবিয়ে দেবে। কোনো ভয় নেই।"

ওরা সবাই আগুনের দিকে মুখ করে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখতে দেখতে ওদের মুখ আর গাল দুটো তেতে লাল হয়ে উঠল। পিঠ কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা।

পাহাড়ের ঢালে যত বাড়ি ছিল, সেখানকার সব ছেলে-মেয়েরা আগুনের আলো দেখতে পেয়ে চারদিকে এসে জড়ো হল। বড়রাও কেউ কেউ এল। এমন কি পাহাড়ের তলায় ধানখেতি থেকে শ্যাম আর শ্যামের বাবাও।

মা ছোটদের জন্য ঘরে তৈরী বিস্কুট আর বড়দের জন্যে ছোট ছোট মগে করে গরম চা নিয়ে এলেন। কানু যেই দেখল শ্যাম তার বাবার মগ থেকে চা খাচ্ছে, অমনি সে-ও নানার মগ থেকে লম্বা লম্বা চুমুক দিতে লাগল। মা বললেন, বড়দের পেয়ালা থেকে ছোটদের খাওয়া ঠিক নয়। এই বলে ছোটদের জন্যও খুদে খুদে পেয়ালা করে চা আনলেন।

সকলের সে কি আনন্দ! তারপর আস্তে আস্তে আগুনের শিখা ছোট হয়ে এল, আগুনও নিবে এল। হঠাৎ সকলের বেজায় শীত করতে লাগল। তারা নমস্কার জানিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল।

কানুও মার আর নানার সঙ্গে ঘরে গেল। তাদের কাপড়-চোপড়ে পোড়া পাতার গন্ধ লেগেছিল। সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সকলের মনে কি আনন্দ! গরম গরম লুচি আর পেঁয়াজ ভাজা, বাগান থেকে তোলা ফুলকপি খেতে খেতে ওরা কতই না খোস-গল্প করতে লাগল।

মা বললেন, "পাহাড়ের নিচেকার সমান জমিতে কখনো এত শীত পড়ে না। সেখানে সবাই পথ চেয়ে থাকে, কখন শীতকাল আসবে। এখানকার ঠাণ্ডা বাতাসে সব ফুল মরে যায়। ওখানে শীতকালে কত মৌসুমী ফুল ফোটে। অবিশ্যি শালগাছগুলো এই সময় পাতা ঝরায়, ঠিক আমাদের ন্যাসপাতি গাছের মতোই। শীত কেটে গেলে শালগাছে ফুল ধরে। ফুলের সাদা রেণু গাছের গোড়ায় ছোট ছোট ঢিপির আকারে পড়ে থাকে। দখিণ হাওয়া বইতে শুরু করে, শালের রেণুকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কারো নাকে ঢুকলে, সে অমনি হাঁচতে আরম্ভ করে। শালফুলের ভারি মিহি একটা মিষ্টি গন্ধ হয়। সেই গন্ধের জন্য আমার মন কেমন করে।"

কানু একটু চটে গেল। সে বলল, "কেন, আমাদের ন্যাসপাতি গাছও তো ঐ রকম। শীত চলে গেলে, ওরাও তো কি সুন্দর সাদা ফুলে ঢেকে যায়। একটাও পাতা দেখা যায় না ; শুধু ফুল আর ফুল ; না, নানা ?"

নানা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, "তারপর ফুলের-পাপড়ি ঝরে যায় আর ছোট্ট ছোট্ট ন্যাসপাতি দেখা দেয়। পাথরের মতো শক্ত আর বিষ তেতো ! ঠিক সেই সময় পাতার কুঁড়িগুলোও খুলে গিয়ে কচি কচি ফলের উপর যেন পাতার ছাতি তুলে ধরে; যাতে ওদের ঠাণ্ডা না লাগে। তারপর ফলগুলো ক্রমে বড় থেকে আরো বড় হতে থাকে। ডালপালাও কেমন ফলের ভারে একটু একটু করে নিচু হতে থাকে, দেখেছিস্ দাদু ? কিন্তু এ দেশটা এতই ঠাণ্ডা যে ফল পেকে খাবার যুগ্যি হতে অনেক মাস লেগে যায়।"

মাও বললেন, "ঠিক তাই। আমাদের সোনালি গাঁয়ের আমও ঐ রকম। ফুল ঝরে গেলে, পাতার কুঁড়ি সব খুলে যায়, যাতে খুদে খুদে আমগুলো রোদের আর জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব থেকে বাঁচতে পারে। তবে আমাদের দেশটা গরম, তাই তিন চার মাসেই ফল পেকে যায়। সব জায়গায় এক রকম বাবা। যেখানেই যাবি দেখবি, প্রকৃতি কেমন তার ছেলেমেয়েদের যত্ন করে। জানিস্, যে-সব দেশ এত ঠাণ্ডা, যেখানে সব কিছু জমে যায়, একটা পাতাও দেখা যায় না, সেখানকার জন্তু-জানোয়াররা নিরাপদ গর্ত খুঁজে নিয়ে, সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। গাছের শিকড় মাটির নিচে বিশ্রাম করে। পাখিরা গরম দেশে উড়ে চলে যায়। আমাদের সোনালি গাঁয়েই তো প্রতি বছর হাজার হাজার কাঁদা-খোঁচা, বুনো-হাঁস আসে। গ্রামের চারদিকের খাল-বিল আর পুকুরের কাছে তারা শীতকাল কাটিয়ে, আবার যে যার দেশে ফিরে যায়। চল্ রে কানু, শোবার সময় হল।"

আট

দিনগুলো ক্রমে আরো ছোট হয়ে এল। দেখতে দেখতে বিকেল সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতে অন্ধকার নামত, যদিও তখনো লাইকর পাহাড়ের চূড়োতে দেখা যেত পাথরের উপর রোদ পড়ে ঝক-ঝক করছে।

নানা বলল, "এখনো আসলে সূর্যটা ডুবে যায় নি। শুধু ঐ পাহাড় গুলোর আড়ালে নেমে গেছে।" সন্ধ্যেগুলোকে যেন বড় বেশি লম্বা মনে হত। এত ঠাণ্ডা যে বাইরে বেরিয়ে মাছ ধরার কি ঘুড়ি ওড়ানোর জো ছিল না। নানা তার কাঠ-খোদাইয়ের যন্ত্রপাতি বের করে এনে, নরম কাঠে খোদাই করে কেমন করে কুকুরের মাথা, ড্রাগনের মাথা তৈরী করতে হয় কানুকে শেখাতে লাগল। সেগুলো দিয়ে হাতছড়ির চমৎকার হাতল হয়।

অল্প দিনের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। শীতের লম্বা ছুটি। এই ঠাণ্ডা সময়টা এড়িয়ে যাবার জন্য কেউ কেউ পাহাড় থেকে নেমে গেল। কিন্তু নানার আর কানুর দুজনেরই শুকনো শীতকালটাকে বেজায় ভালো লাগত। বিশেষ করে সকালবেলা। তখন সমস্ত পাহাড়ের গায়ে হিম জমে গিয়ে সাদা ঝকঝক করত।

একদিন কানু বলল, "আচ্ছা, নানা, আমি তো কখনো আকাশ থেকে ঐ সাদা হিমগুলোকে পড়তে দেখিনি। কেন বল তো? আমি যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকি, তখন পড়ে বুঝি?"

নানা বলল, "না রে, দাদু। ও হিম তো আকাশ থেকে পড়ে না। ঠাণ্ডা মাটিতে শিশির পড়ে জমে বরফ হয়ে যায়। আমাদের পাহাড়গুলো এত উঁচু নয় যে বরফ পড়বে।"

সূর্যের আলো লাগলেই সমস্ত হিম গলে জল হয়ে যেত।

রোজ বসবার ঘরের চুল্লিতে কাঠের আগুন জ্বালা হত। ওরা সবাই চুল্লিটাকে ঘিরে বসে খাওয়া-দাওয়া সারত। কি গরম, আর কি যে আরামের! কানু চুল্লির আগুনের ভিতর তাকিয়ে থাকত। মনে হত যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কত শহর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কত যুদ্ধ হচ্ছে, কত আগুনের পাহাড়ের ভিতর থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। ও-সব পাহাড়কে আগ্নেয়গিরি বলে। নানা আগ্নেয়গিরি দেখেছে।

এমন সময় বাপুর কাছ থেকে একটা চিঠি এল। বাপু লিখেছে যে

শীতকালটা ওদের সঙ্গে কাটাতে পারবে বলে মনে হয়। দু-মাসের ছুটি পেয়েছে। শুনে সবার কি উৎসাহ! মা তো ডাকপিয়নকে চা-মিষ্টি খাওয়ালেন। লোকটা উ-বিনের ভাইপো। মুলকির প্রত্যেক বাড়িতে ওর বন্ধু-বান্ধব ছিল। তাই কাজের রঁদ শেষ করতে রোজ ওর দেরি হয়ে যেত। নানা তাই নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করত। বলত, "ওর পেটটি যদি ভরতি আর গরম থাকে, তাহলে শীতের মধ্যে পাহাড় চড়তে ওর একটুও কষ্ট হয় না।" লোকটার নাম ছিল ডো-রেন।

এই ডো-রেনই একদিন কানুকে বলেছিল সংরক্ষিত বনে নাকি একটা মৌ-গাছ আছে। বসন্তকালে একদিন সকালবেলায় ও নাকি দেখেছিল মৌ-গাছ থেকে এক ঝাঁক মৌমাছি উড়ে চলে যাচ্ছে। সে আরো বলেছিল যে একটা মৌচাকে কখনো দুটি মৌ-রানী থাকে না। মৌচাকে সর্বদা একজন মৌ-রানী, কয়েকটা নিষ্কর্মা পুরুষ মৌমাছি আর হাজার

হাজার কর্মী মৌমাছি থাকে। এরা সর্বদা কাজে ব্যস্ত ; ফুল থেকে রেণু জড়ো করছে, সেগুলো চাকে নিয়ে যাচ্ছে, চাকের দেয়াল গড়বার জন্য মোম তৈরী করছে, বাচ্চাদের জন্য মধুর ব্যবস্থা করছে। এরাই মৌচাকটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে। মৌ-রানী শুধু ডিম পাড়ে, আর কোনো কাজ করে না। এমন কি নিজের ডিমের কিম্বা ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে যত্ন পর্যন্ত করে না। কর্মী মৌমাছিরা সব কিছু করে।

যদি কখনো দৈবাৎ একই মৌচাকে আরেকটা নতুন মৌ-রানী জন্মায়, তাহলে তাকে নিয়ে একদল কর্মী আর পুরুষ মৌমাছি উড়ে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় নতুন চাক বানায়।

মাও এসব কথা জানতেন। সোনালির কাছে শালবনে মাও একটা মৌ-গাছ দেখেছিলেন। মৌ-গাছটা আর কিছু নয়, শুধু একটা মরা শিরীষ-গাছ। তার গুঁড়িটা একেবারে ফোঁপরা। সব পাতা মরে ঝরে গেছে, ছাল শুকিয়ে খসে গেছে, গুঁড়ির এখানে ওখানে ফাটল ধরেছে, সেই ফাটল দিয়ে ভিতরকার মৌচাক দেখা যায়। মাঝে মাঝে একটু মধু গাছের ফাটল বেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে, আর অমনি সেই খুদে মধুর স্রোতের কাছে পিঁপড়ে জমে। অবিশ্যি পিঁপড়েরা মৌচাকের খুব বেশি কাছে যায় না, কারণ তা হলে টহলদার মৌমাছিরা ওদের অমনি ধরে মেরে ফেলবে।

এসব কথা শুনে কানুর সে কি উৎসাহ। তারও মৌ-গাছ দেখার শখ। সে বলল, "মা, চল, সোনালি গ্রামে যাই।" কাছেই, আগুনের পাশে নানা বসেছিল। সে বলল, "এত দূরে যাবার দরকার কি, দাদু? আমিই তোকে একদিন এখানকার জঙ্গলের মৌ-গাছ দেখিয়ে আনতে পারি। তবে শীতকালে তো আর মৌমাছিরা বাইরে বেরুবে না। তার চেয়ে বরং বসন্তকাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই ভালো।"

কানুর কিন্তু একটুও অপেক্ষা করার ইচ্ছা ছিল না। "না, না, এখনি চল না, মৌ-গাছটাকে তো দেখতে পাব। মৌমাছি দেখতে না হয় বসন্ত-কালে আবার যাব।" মার কিন্তু তাতে মত ছিল না। "মৌমাছি না দেখতে পেলে, শুধু মৌ-গাছ দেখে কি হবে?"

এমনি করে একটার পর একটা দিন কাটতে লাগল। একদিন খুব রোদ উঠেছিল, মা আর অন্যরা সবাই দুপুরের খাবার পর শুয়ে বিশ্রাম
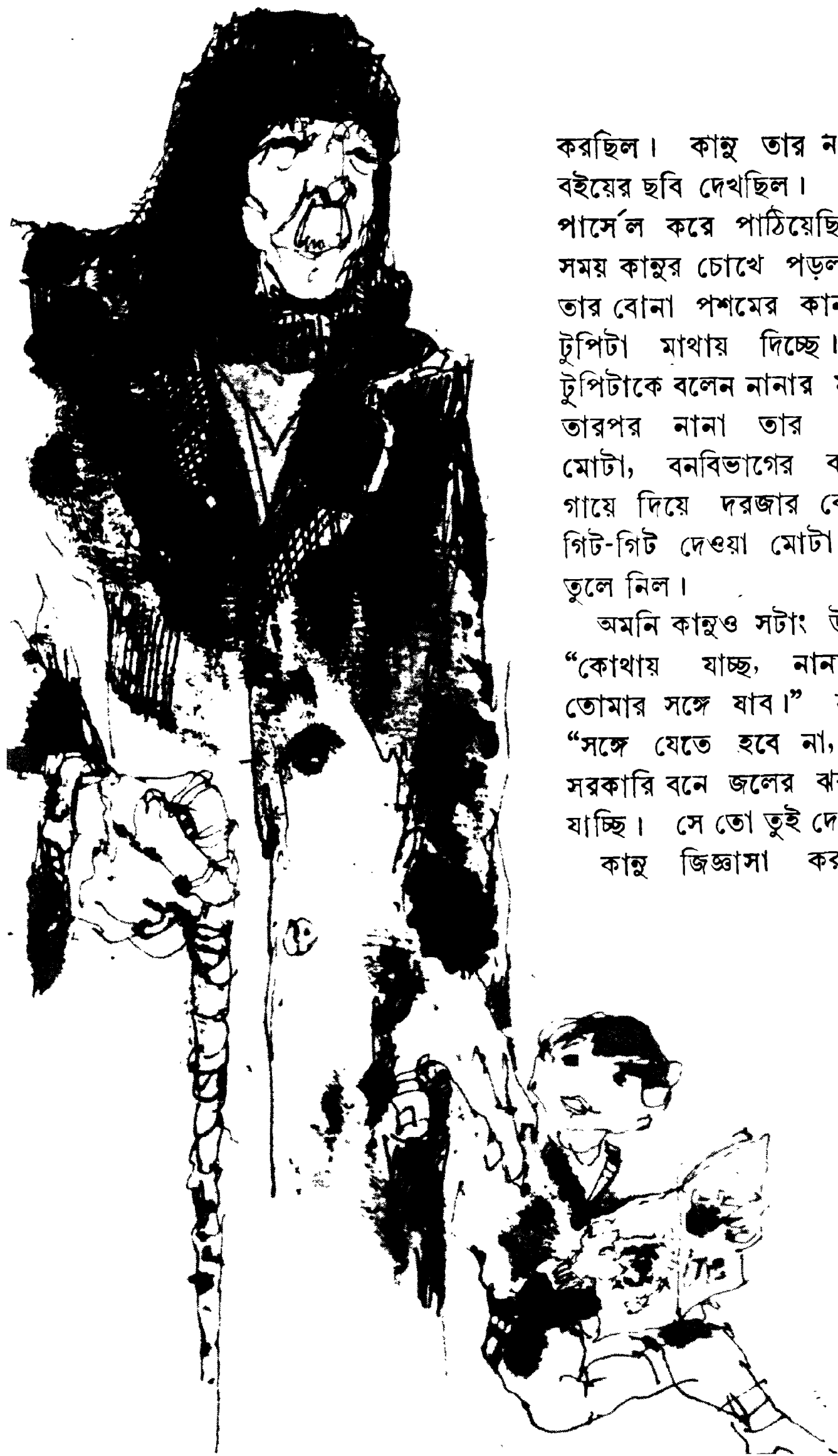
করছিল। কানু তার নতুন বাঘের বইয়ের ছবি দেখছিল। বইটা বাপু পার্সেল করে পাঠিয়েছিল। এমন সময় কানুর চোখে পড়ল যে নানা তার বোনা পশমের কান-গলা-ঢাকা টুপিটা মাথায় দিচ্ছে। মা এই টুপিটাকে বলেন নানার মঙ্কি-ক্যাপ। তারপর নানা তার তালি-মারা, মোটা, বনবিভাগের বড় কোটটা গায়ে দিয়ে দরজার কোণা থেকে গিট-গিট দেওয়া মোটা লাঠি-গাছি তুলে নিল।

অমনি কানুও সটাং উঠে বসল। "কোথায় যাচ্ছ, নানা? আমি তোমার সঙ্গে যাব।" নানা বলল, "সঙ্গে যেতে হবে না, আমি শুধু সরকারি বনে জলের ঝরণা দেখতে যাচ্ছি। সে তো তুই দেখেছিস্।"

কানু জিজ্ঞাসা করল, "তুমি

দেখনি ?” “দেখেছি বৈকি ; আরে ব্যাটা, তুই তো জানিস্ যে ঐখানে, ঝরণার কাছে, আমার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে আমি অনেক বছর কাটিয়েছি। কেউ ঝরণার জল নোংরা না করে, তা দেখাই আমার কাজ ছিল। এখন তো ঝরণার চারিদিকে দেয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই কারো থাকবার দরকার নেই। দশ বছর ঐ ঘরবাড়িগুলো দেখিনি। এতদিনে নিশ্চয় সব ভেঙ্গে পড়ে গেছে। শুয়ে পড়, দাদু, নইলে তোর মা রাগ করবে।” এই বলে, একবারও পিছনে না তাকিয়ে নানা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

নানা বনের ধারে পৌঁছতে না পৌঁছতে, কানু তাকে ধরে ফেলল। কানুকে দেখেই নানা এমনি রেগে গেল যে তখুনি আবার ফিরে বাড়ির দিকে চলল। কানু এমনভাব দেখাল যেন নানাকে দেখতেই পায় নি। সে ঘন বনের পথ ধরল। ইচ্ছা হলে নানা বাড়ি যেতে পারে, কিন্তু কানু যাবে না। সে ঝরণার কাছে কোথায় মৌ-গাছ আছে তাই খুঁজে দেখবে। শেষ পর্যন্ত নানাকেও তার সঙ্গে আসতে হল। রাগে সে গজ্‌গজ্ করতে লাগল, “তোর মা যে কি বলবে তা জানি না।”

কানু বলল, “মা রাগ করবেন কেন? আমি তো মোটা কোট আর পুরু গরম মোজা পরে এসেছি নানা।” এর আগেও কানু এক দলের সঙ্গে চড়িভাতি করতে এদিকে এসেছিল। সেবার মুলকির সবাই এসেছিল। গান-বাজনা, ঠাট্টা-তামাসা আর কত রকম খেলা হয়েছিল। এবার কিন্তু সব কিছুই অন্য রকম। বনটা যেন আরো ঘন, গাছগুলো একেবারে ঘেঁষাঘেষি করে রয়েছে। বাইরে দুপুরবেলার ঝক-ঝক রোদ কিন্তু এখানে গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে অনেক কষ্টে, কুচিকুচি হয়ে এসে পৌঁছচ্ছিল। চারদিকটা কেমন যেন অদ্ভুত সবুজ আর সে কি বেজায় ঠাণ্ডা!

কোটের মধ্যে কানুর কাঁপুনি ধরে গেল। পায়ের নিচের মাটিটাও ভিজে স্যাঁৎসেঁতে। গাছের ডাল থেকে ছাই আর ফিকে সবুজ রঙের কি সব ঝুলে আছে। দেখাচ্ছে যেন বুড়ো মানুষদের চুল-দাড়ি।

নানা বলল, "ওগুলোও গাছরে। ওরা এই এত ভালো মাটি থেকে রস শুষে না নিয়ে, অন্য গাছের শিরা থেকে রস টেনে নেয়। দেখিস্ দাদু, ঝোপ-ঝাপের বেশি কাছে যাস্ নে। শেষটা তাদের একজন যদি ফণা তুলে ধরে!" বনের মধ্যে নানা কখনো 'সাপ' কথাটা উচ্চারণ করত না। কানু বলল, "সে কি, আমি তো ভেবেছিলাম ওরা সারা শীত ঘুমিয়ে কাটায়।" "আরে, মাড়িয়ে দিলেও কি আর ঘুমোয়! আয়, সরে আয়।" কানু ঝোপের কাছ থেকে সরে এল।

হঠাৎ তার কান খাড়া হয়ে উঠল। জল পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে না? বনের নিজস্ব সব ছোট-খাটো শব্দ। উঁচু গাছের ডালে পাখিরা খড়-মড় করে উঠে। সরলগাছের লম্বা পাতার মধ্যে বাতাস শোঁ-শোঁ শব্দ করে। খুদে খুদে জানোয়ারদের ছোট্ট ছোট্ট পায়ে ছুটে পালাবার শব্দ হয়। দিনের আলোতেও ঝিঁঝি-পোকার তান ধরে। কিন্তু যত রকম শব্দ শোনা যায়, তার মধ্যে জল পড়ার শব্দ কানুর সবচেয়ে ভালো লাগে। দেখতে পাবার অনেক আগেই জলের আওয়াজটুকু শোনা যায়। কানু বলে উঠল, "ও নানা, ঐ নিশ্চয় ঝরণার জল পড়ছে।"

নানা বলল, "ঝরণাগুলো আরো খানিকটা উঁচুতে, দাদু। জল পাইপে ধরে নি, ছোট্ট নদী হয়ে বয়ে যাওয়ার শব্দ। ওটাও অবিশ্যি ঝরণারই জল; কেমন পাহাড় বেয়ে নেমে, বড়পানির পথ ধরেছে। শুনতে পাচ্ছিস্, কেমন খিল-খিল, কল-কল করে হাসতে হাসতে, গান গাইতে গাইতে ছুটে নামছে, শোন্ একবার! নদীর তলাকার ছোট ছোট পাথর-গুলো জলের ঘষা খেয়ে খেয়ে কেমন গোল মোলায়েম হয়ে যায় দেখেছিস্? ওগুলোকে নুড়ি বলে।"

বনের মাঝখানে আরো বেশি অন্ধকার; কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। কানু নানার কাছে ঘেঁষে এল। "আয়, দাদু, আমার হাত ধর্ দিকি। এবার আমরা ঐ পাথর বেয়ে উঠে বেশ একটা শর্ট-কাট করব।"

পাহাড়ের খাড়াই ঢাল বেয়ে ওরা উঠতে লাগল। পাথর আঁকড়িয়ে পার হয়ে, পা রাখার নিরাপদ জায়গা খুঁজে দেখে দেখে, চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে, গাছের শিকড় ডাল-পালা ধরে লম্বা লম্বা শুকনো শক্ত ঘাস ধরে ঝুলে ঝুলে, শেষ পর্যন্ত তারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য জায়গায় গিয়ে পৌছল। এখানে গাছপালার ভিড় নেই, চারদিকটা রুক্ষ, ন্যাড়া, পাথুরে। পাহাড়ের সেই পাথুরে গায়ে তিন চারটি ছোট ছোট গর্ত থেকে বুড়-বুড় করে জল বেরুচ্ছে।
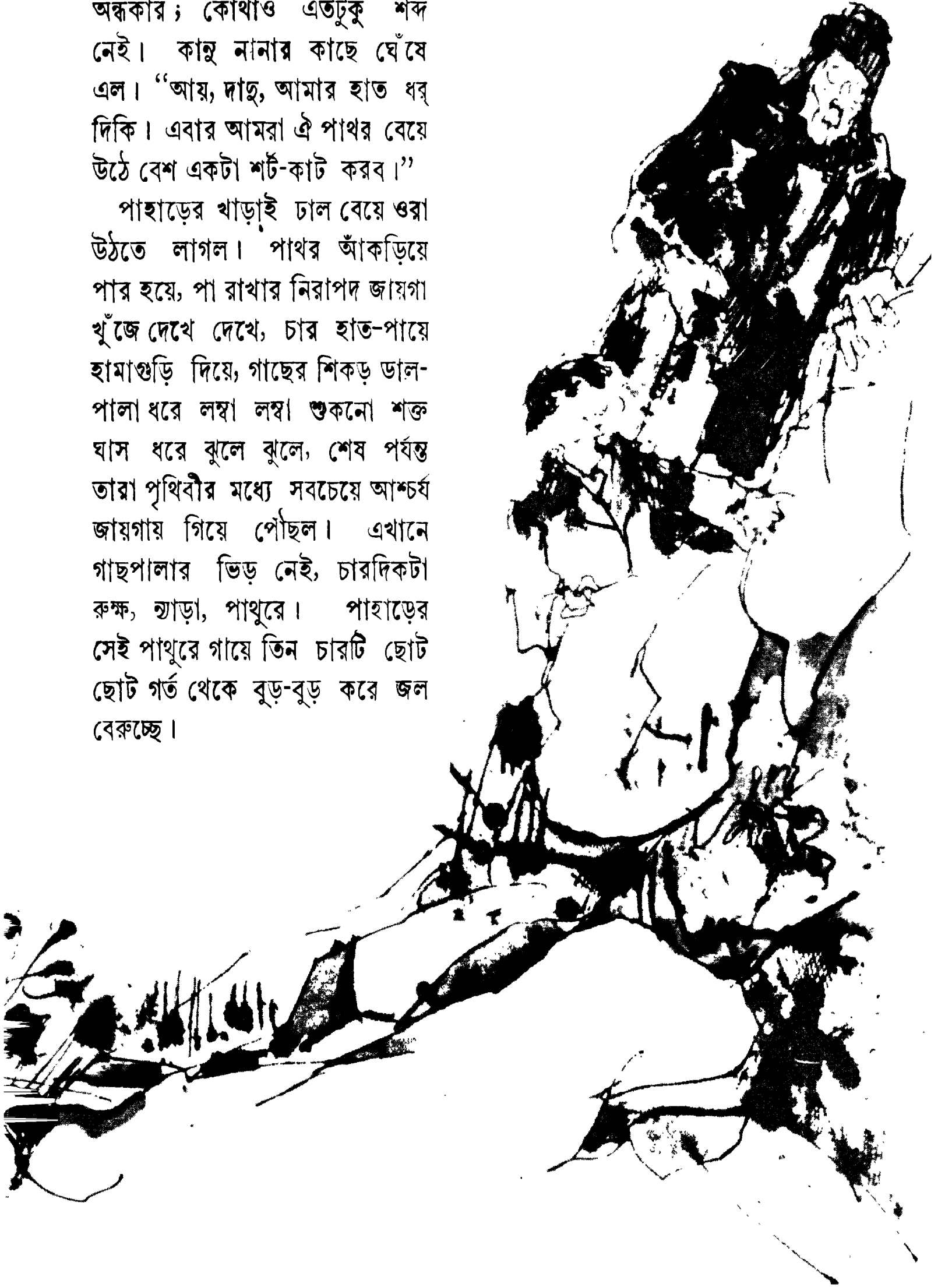
এর আগে কানু কখনো এতটা উঁচুতে উঠেনি ; সেই যেবার এখানে চড়িভাতি করতে এসেছিল, তখনো না। সব দেখে শুনে সে তো অবাক। এইকি তবে সেই জলের ঝরণা, যেখান থেকে এত বড় শহরটার সব জায়গায় জল যায় ?

"ও নানা, দেখ দেখ কত জল বয়ে চলে গিয়ে নষ্ট হচ্ছে। লোকে তা হলে খাবে কি ?"

নানা বলল, "বাজে বকিস্ নে, দাদু। মোটেই নষ্ট হচ্ছে না, ঐ জল যাচ্ছে বড়পানির সঙ্গে মিলতে। খানিকটা জল তৃষ্ণার্ত মাটি শুষে নেবে ; গরু, ছাগল, ভেড়া পাহাড়ের উপরকার ঘাস-জমি থেকে নেমে, বাড়ি ফেরার সময় নদী পার হতে হতে খানিক জল খেয়ে নেবে। এসবকে নষ্ট হওয়া বলে নাকি ? শহরের পানীয় জল ঐ যে আরো উঁচুতে যে-সব ঝরণা আছে, সেখান থেকে যায়।"

কানু উপর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল আরো কত ঝরণা। তার উপরে নিচু নিচু ছাদ আর চারদিকে দেয়াল তৈরি করা রয়েছে। উপরে উঠে ওরা সেই সব ঝরণার কাছে গেল। দেখল দেয়ালগুলো একেবারে ছাদ অবধি পৌঁছয় নি। মাঝখানে হাতখানেক ফাঁক, তার উপর মজবুত জাল দিয়ে ঘেরা, যাতে ভিতরে হাওয়া চলাচল করতে পারে।

কানু সেই জালের মধ্যে দিয়ে চেয়ে দেখল আরো কত গর্ত। তার মধ্যে থেকে বুড়-বুড় করে জল বেরিয়ে, খুদে খুদে নদী তৈরি হচ্ছে। সেই খুদে নদীগুলো আবার এক সঙ্গে মিলে আরেকটা বড় নদী হচ্ছে। সেইখান থেকে মস্ত মস্ত কালো নলে করে জল চলে যাচ্ছে। একটু জল বাকি থাকছে ; সেটুকু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে নামতে অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসা আরো অনেক ছোট্ট নদীর সঙ্গে মিশে, ষাট কিলো-মিটার দূরে বড়পানির জলের সঙ্গে মিলবে বলে ছুটে চলেছে।

নয়

কানু নানাকে জিজ্ঞাসা করল, "নলগুলো কোথায় যাচ্ছে?" "কেন, মুলকির কাছে সেই যে উঁচুতে বসানো বড় ট্যাঙ্ক আছে, সেইখানে যাচ্ছে। তারপর সেখান থেকে নলে করে শহরের সব জায়গায় যাবে। তবে নলের জল হল কয়েদী জল, তাকে আর বড়পানির সঙ্গে মিলতে হয় না। চল্ দাদু ফেরা যাক্। এখানে এলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।"

"কেন মন খারাপ হয়, নানা?"

"কারণ অনেক দিন আগে আমি যে এখানেই থাকতাম, দাদু। আমার বাড়ি কোথায় ছিল দেখবি তো আয়।"

ছোট্ট এক টুকরো সমান জায়গা, তারি মাঝখানে চ্যাপ্টা পাথরের ছোট একটা ঢিপি। নানা বলল, "ঐ দেখছিস্, ঐ পাথরগুলো দিয়ে আমার বাড়ির ভিৎ তৈরী হয়েছিল!"

হাত দিয়ে নানা কয়েকটা পাথর সরাতেই, ভিতর থেকে একটা ছোট্ট কাঠের বল গড়িয়ে বেরিয়ে এল। এক সময় বলটাতে লাল রং করা ছিল, এখন রংটা জ্বলে গেছে। বলটাকে কুড়িয়ে নানা কানুর হাতে দিল।

"নে, ধর্। আমার বৌয়ের একটা ছোট্ট ছেলে ছিল। এটা তার জন্য বানিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেটা বাঁচল না। চল্, দাদু বাড়ি যাই। অনেক দেরি হয়ে গেল।"

বাড়ি পৌছতে পৌছতে সূর্য ডুবতে আরম্ভ করেছিল। লাইকরের রাস্তায় মা ওদের খোঁজে এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছিলেন, মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।

মার ভয় হয়েছিল, নিশ্চয় ওদের কোনো বিপদ হয়ে থাকবে। এখন ওদের দেখামাত্র বেজায় রেগে গিয়ে নানাকে অনেকগুলো কড়া কথা বলে কানুর গালে জোরে এক চড় কষিয়ে দিলেন। তারপর হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে, কানুকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে ছুটে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলেন।

রাতের খাবার সময় হলে মা নানাকে বললেন, "কাকা, আজ থেকে আপনার খাবার আপনার ঘরে দিলেই ভালো হয়। আপনার কাছে থাকলে কানু বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।" তারপর কানুর দিকে ফিরে বললেন, "ফের যদি নানার সঙ্গে বেরোস্ তো তোকে পিটিয়ে ছাতু করব। আর খবরদার ঐ জঘন্য নোংরা পুরনো বল্টা ছুঁবি না।" এই বলে, কানুর হাত থেকে বল্টা কেড়ে নিয়ে, জানলা খুলে বাইরে ফেলে দিলেন। নানা কিছু বলল না। পা দুটোকে টানতে টানতে নিজের ঘরে চলে গেল। খাবার নিয়ে গেলে ফিরিয়ে দিল।

পরদিন সকালে কানুর প্রথম কাজ হল এক দৌড়ে নানার ঘরে যাওয়া। নানা ঘরে ছিল না। নানার মোটা লাঠি, কম্বল, চামড়ার তৈরি পুরনো বন-বিভাগের ব্যাগটিও ছিল না। কানু আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এসে বাঘের বইটা খুলে অনেকক্ষণ ধরে একটা পাতার দিকেই চেয়ে রইল।

একটু পরে, কান্থাই বলে যে মেয়েটি রান্নাঘরের কাজ করত, সে নানার দুধ রুটি নিয়ে নানার ঘরের দিকে চলল। কানু মাথা তুলে বলল, "নানা দুধ রুটি খাবে না, নানা চলে গেছে।" এ কথা শুনেই মা খাবার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন।
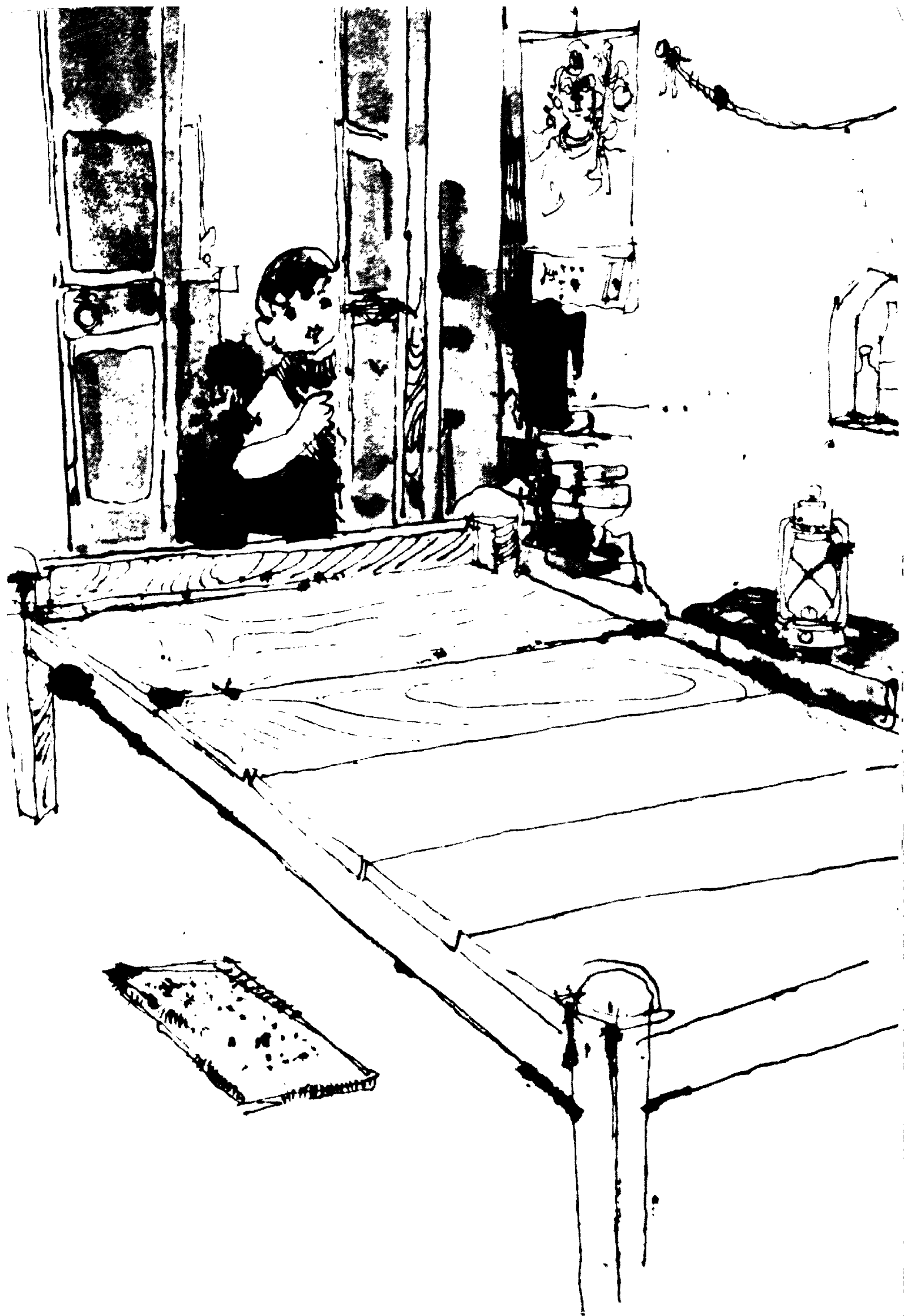
"নানা চলে গেছে কি বলছিস? প্রায় আশী বছরের বুড়োমানুষ এই শীতে যাবে কোথায়?"

কানুর গলার ভিতরটা টন-টন করতে লাগল।

"কি জানি, হয়তো বড়পানিতে গেছে। ওখানেই তো নানার নৌকো আসবে। ওর বৌকে খুঁজতে যাবে। বৌয়ের ছেলের জন্য নানা বল্ তৈরী করেছিল। তুমি সেটা ফেলে দিলে। ছেলেটা মরে গেছে।"

শুনে মার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। তিনি আস্তে আস্তে সবজি বাগানে গিয়ে, বল্‌টাকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন। আঁচলের কোনা দিয়ে বল্‌টাকে মুছতে মুছতে মা বললেন, "কাল যখন তোর বাবা কলকাতা থেকে এসে নানার কথা জিজ্ঞাসা করবেন, আমি তাঁকে কি বলব?"

কানু বলল, "বাপু নানার জন্য গরম গেঞ্জি আনবে। দুপাশে রবার দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতো আনবে। তাহলে পায়ে আরাম লাগবে। চামড়ার জুতো পরলে নানার পায়ের কড়াতে লাগে।" এই বলে কানু কাঁদতে লাগল।

মা উঠে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এখানে পরদা টেনে সোজা

করলেন, ওখানে বই কটা গুছোলেন। তারপর, আবার বসে পড়ে বললেন, "ঠিক জানিস্ বড়পানির দিকে গেছেন? বাস্ ধরলেন নাকি?"

কানুর হাসি পেল। "বাস্ ধরবে কি! ধানখেতি নদীর ধারে ধারে যেতে হবে যে, যতক্ষণ না ধানখেতি বড়পানিতে মেশে। কে জানে নানার জন্য নৌকোটা কোথায় অপেক্ষা করছে।"

ও যে কি বলছে মা কিছুই বুঝলেন না, তবু বললেন, "তা হলে চল্, আমরাও সেই পথেই যাই। কাকাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সব আমার দোষ। কাকার মতো কেউ হয় না।"

তৈরী হয়ে নিতে ওদের বেশি সময় লাগল না। ছোট একটা থলিতে ভরে মা কিছু শুকনো খাবার নিলেন। নিজের জন্য একটা লাঠি নিলেন, কানুকে একটা দিলেন। দুজনেই গায়ে গরম জামা, পায়ে মজবুত জুতো পরে নিলেন। কানু সেই ছোট্ট বল্টাকে পকেটে পুরল। ওটা নানার দেওয়া। ফেলে রেখে যাওয়া যায় না।

মুলকির কাছে পৌঁছবার অনেক আগেই, সেই যে ছোট্ট সরু নালায় করে বাড়তি জল ঝরণা থেকে নামছিল, তার সঙ্গে আরো অনেক নালার জল মিলে, বেশ বড় একটা পাহাড়ী নদী হয়ে গিয়েছিল। মুলকির এই নদী ঝির-ঝির করে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগল। পাহাড়ের নিচে খুদে নদীটি যেন ঘাঘরা মেলে দিয়ে সুন্দর জলপ্রপাত হয়ে, ঝপাং করে ধানখেতির নদীতে পড়ল। তারপর দুজনে মিলে জল ছিটিয়ে, কল-কল শব্দ তুলে নিচের দিকে চলল।

কি সুন্দর জায়গা। নদীর কিনারায় ফার্ণ গাছ। তারা ঠিক যেন কোমল সবুজ পাতা দিয়ে তৈরী বড় বড় সবুজ ছাতা মাথার উপর তুলে ধরেছে! নদীর ধারে ধারে পায়ে চলা পথ। ওদের ঐ পথ ধরেই যেতে হবে।

কানু একটা ছায়ায় ঢাকা জায়গা দেখিয়ে বলল, "ঐখানে অনেকে মাছ ধরে। বর্ষায় যখন জল বাড়ে, তখন মাঝে মাঝে হোলডার সাহেবের বাগান থেকে ট্রাউট-মাছ ভেসে বেরিয়ে সাঁতার কেটে ধানখেতির জলে এসে পড়ে। লোকরা ওদের এইখানে ধরে।"

মা অবাক হয়ে গেলেন। "এত কথা তুই জানলি কি করে কানু?" "নানা কখনো কখনো আমাকে এইখানে নিয়ে আসে।" সরলগাছের লম্বা লম্বা পাতার মধ্যে শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। মার হাঁপ ধরে গিয়েছিল। "আয়, এখানে একটু বসা যাকরে কানু। একটু জিরিয়ে না নিলে আর হাঁটতে পারছি না।"

একটা চ্যাপ্টা পাথর সকালের রোদে গরম হয়েছিল। মা তারি উপর বসে পড়ে, নিজের হাঁটু দুটো ঘসতে লাগলেন। পাহাড় থেকে নামার সময়, গায়ের সব ওজন হাঁটুর উপর পড়ে, তাই হাঁটুতে ব্যথা করে। বুড়োদের ব্যথা করে, মার, নানার; কিন্তু কানুর করে না।

মা বিশ্রাম করতে লাগলেন আর কানু এদিক ওদিক দেখতে লাগল। পাথরের তলায় একটা গর্ত। তার একধারে খানিকটা জল জমে আছে। সেখানে ঘি-রঙের ব্যাঙের ছাতা হয়েছে। দেখতে ঠিক পালকের মতো। নানা বলেছে ওগুলোকে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজলে চমৎকার খেতে লাগে।

মা কিন্তু কানুকে ব্যাঙের ছাতা ছুঁতে দিতেন না। বলতেন ছুঁলে নাকি হাতে ঘা হয়। ব্যাঙের ছাতা খেয়ে কত লোকে নাকি মরে গেছে। নানা বলেছিল বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতাও আছে বৈ-কি! চিনতে পারা চাই। এই পালকের মতো ব্যাঙের ছাতা খেতেও যেমন মিষ্টি, খেলে কারো কোনো অনিষ্টও হয় না।

কানু গর্তটার ভিতরে উঁকি মেরে দেখল। ভিতরে দুটি আলোর ফুলকি চকচক করছিল। ওখানে একটা জলের ইঁদুর থাকে, তারি চোখ। শেষ বার যখন কানু দেখেছিল, তখন ওর চারটে বাচ্চা ছিল। নানা আর কানু উঁকি মারতেই মা-ইঁদুর দাঁত খিচিয়ে উঠেছিল। এতদিনে বাচ্চাগুলো নিশ্চয় বড় হয়ে কোথায় চলে গেছে। মা-ইঁদুরটা একলা এক কোণায়

গুড়ি মেরে বসে, চোখ মিট-মিট করছিল। পকেট থেকে কয়েকটা বাদাম খুঁজে বের করে কানু সেগুলোকে গর্তের মুখের কাছে রেখে সরে গেল। নানা বলেছিল ছোট ছোট জানোয়ারদের দিকে কখনো খাবার জিনিস ছুঁড়ে দিতে হয় না। তাতে ওরা ভয় পেয়ে পালায়।

এখানে এক রকম অদ্ভুত ঘাস গজায়, লম্বা লম্বা পাতা, তাতে ফিকে বেগ্‌নি ডোরা কাটা। আঙ্গুল দিয়ে ঘসলে কি যে মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। গন্ধটা মার বড় ভালো লাগল। এ রকম ঘাস মা আগে কখনো লক্ষ্যই করেন নি।

ওখানে চওড়া পাতাওয়ালা বুনো লিলি ফুলের গাছ হয়েছিল। পাতার নিচে একটুখানি ফেনার ঢিপলি লেগেছিল। দেখে মার কি ঘেন্না! "এ রাম! কার যেন থুতু। মেজে দে, ফেলে দে!"

কানু হাসতে লাগল, "তুমি কিছু জান না, মা। মোটেই থুতু নয়। ফেনার মাঝখানে ছোট্ট একটা পোকা আছে। নিজের গা থেকে ফেনা বের করে তার ভিতরে পোকাটা লুকিয়ে থাকে। গিরগিটিরা চড়াই পাখিরা তাই ওকে খুঁজে পায় না।"

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "নানাই নিশ্চয় তোকে এ সব শিখিয়েছেন, তোর বাবাকে যেমন শিখিয়েছিলেন। এ সব জায়গা তোর বাবাও চেনেন। ওঠ, চল্ রওনা দিই, নইলে নানাকে আর ধরতে পারব না। কাল তোর বাপু এসে পৌছবেন।"
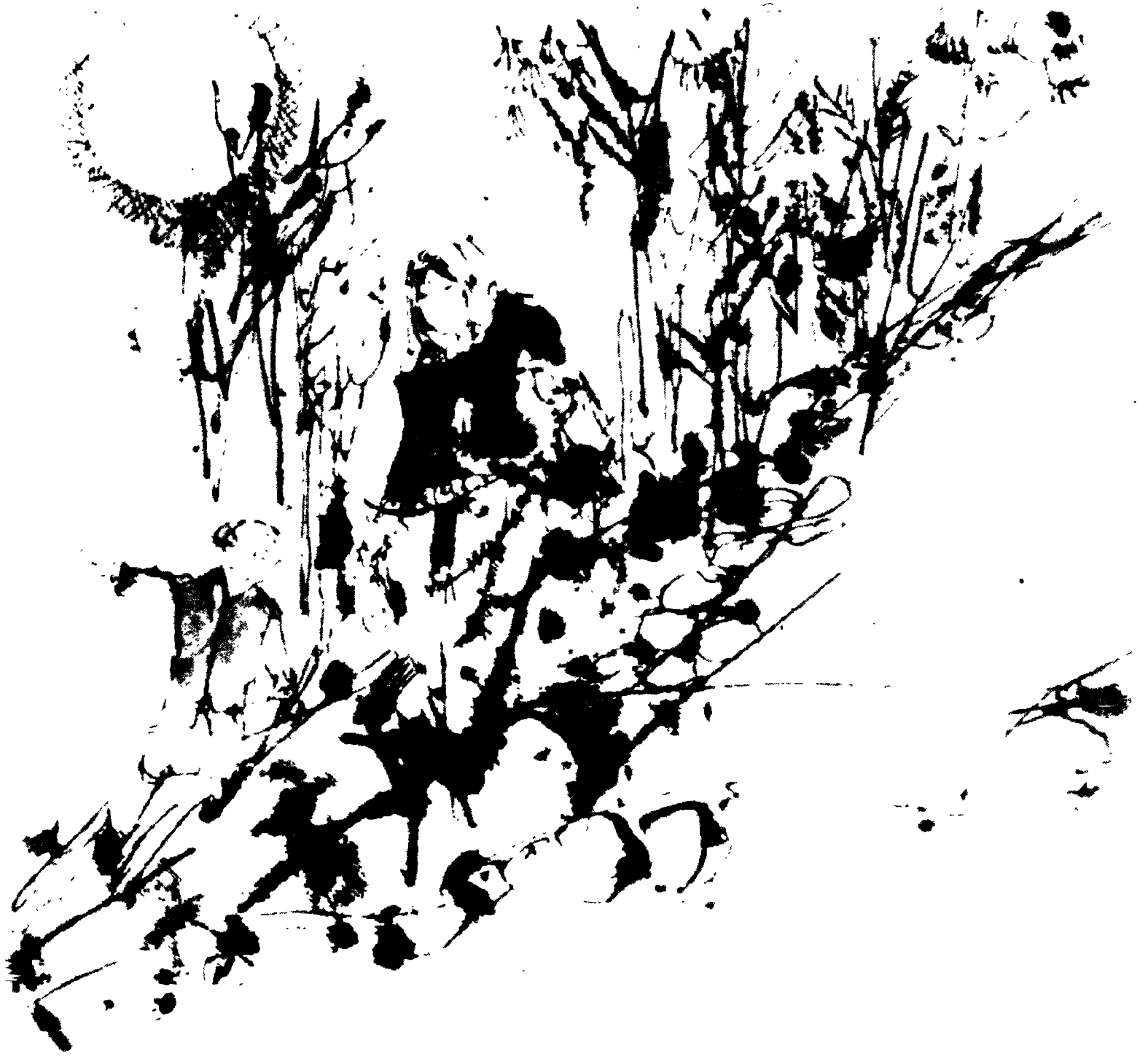
তাই শুনে কানু আহ্লাদে আটখানা হয়ে পা চালিয়ে এগুতে লাগল। "শীগগির কর মা, শীগগির কর। নানা ভারি চালাক, এতক্ষণে নিশ্চয় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।"

দুজনের তেষ্টা পেয়েছিল। নদীর ঘাসে ঢাকা পাড়ে ওরা হাঁটু গেড়ে বসে, দুই হাত জোড় করে পাহাড়ি নদীর ঠাণ্ডা মিষ্টি জল খেল। তারপরেই আবার পথ চলতে লাগল। কেবলি নিচের দিকে চলা, কখনো সমান রাস্তা, কখনো বা এবড়োখেবড়ো। কানু লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যাচ্ছিল, আবার মায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। মাঝে মাঝে হাত ধরে মাকে পাথর পার হতে সাহায্যও করছিল।

দশ

সূর্য মাথার উপর; সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে ওরা ঘেমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নানাকে না নিয়ে তো আর ফেরা যায় না। তাছাড়া ফিরবার সময় সারা পথই চড়াই পাবে। অত পাহাড় চড়বার শক্তি ওদের আর ছিল না।

বেচারা মা, হাঁপাচ্ছিলেন। "কে জানে কোন দিকে গেছেন। হয়তো এদিকেই আসেন নি।"

"না মা, না। নিশ্চয় নদীর ধারে ধারে গেছে। অনেক আগে ধানখেতির সঙ্গে লুমপারিং মিশেছে। আরো কত নদী আছে। কিন্তু সবাই বড়পাণিতে যাচ্ছে। যেটার সঙ্গেই যাও না কেন, বড়পানিতে পৌছবে। ঐখানে নানার নৌকা অপেক্ষা করছে।"

এ-কথা শুনে মা লাফিয়ে উঠে, কানুর পাশে পাশে প্রায় দৌড়ে চললেন। মুখ লাল, চুল উস্কোখুস্কো। সারাতুপুর হাটলো ওরা। বিকেল গড়িয়ে এল। তারপর ওরা মুগুমি পৌছল। সেখানে নদীটা প্রকাণ্ড এক ঝরণা হয়ে তিনশো ফুট ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মা থমকে দাঁড়ালেন। "এবার কি হবে, কানু?" কানু হেসে আঙুল দিয়ে দেখাল ঝরণা কেমন গর্জন করছে আর তারি পাশে পাশে এঁকেবেঁকে সাপের মতো ওদের চলার পথ নেমে গেছে।

"ঐ দেখ পথ, মা। একেবারে ঝরণার তলা অবধি নেমে গেছে। কিন্তু তোমার যে হাঁটুতে ব্যথা মা, নামতে পারবে কি?"

মা বললেন, "না, না, আমার হাঁটুর ব্যথা সেরে গেছে।" এই বলে কানুর আগে আগে দৌড়ে চললেন। জল পড়ার শব্দে কানে তালা লেগে গেল। তুজনে তুজনার কথাও শুনতে পাচ্ছিল না। ঝরণা থেকে রাশি রাশি জলের কণা উড়ে এসে ওদের চুলেতে ভুরুতে লাগছিল। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছিল।

কোনো কথা না বলে ওরা নামতে লাগল। একবার পা হড়কালেই মুশকিল। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে, মা অবাক হয়ে চারদিকে চাইছিলেন। পাহাড়ের খাড়া গা, পাথরের চাঁই, উঁচু উঁচু গাছ, মাথার উপর ঘন নীল

আকাশ, তাতে মেঘের চিহ্ন নেই, কোনো কিছুই যেন সত্যি নয়। তারপর হঠাৎ তারা ঝরণার তলায় পৌঁছে গেল।

যেখানে হুড়মুড় করে জলের ধারা নামছিল সেখানে জলের তোড়ে মাটি সরে গিয়ে, গভীর একটা জলাশয় তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে ঘুর্ণির মতো স্রোতটা কেবলি পাক খাচ্ছিল। রাশিরাশি জলের কণা উড়ে মেঘের মতো জমেছিল। তার উপর বিকেলে সূর্যের আলো পড়ে রামধনু তৈরি হয়েছিল। মা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, মুখে তাঁর কথা নেই। কানুও চুপ করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ ঘুর্ণি-জলের ধারের ঘন ঝাউবনের ভিতর থেকে, নিজের বুকের কাছে কি একটাকে পরম আদরে পরম যত্নে দু'হাতে ধরে, যে লোকটি বেরিয়ে এল, সে নানা ছাড়া আর কেউ নয়।

"নানা! নানা! নানা!" বলে কানু দৌড়ে তার কাছে গেল। মাও ছুটে তার পায়ে পড়লেন। কেঁদে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করুন, কাকাবাবু।"

নানা বেজায় চটে গেল। "ঐ দখ! আরে মেয়ে, এটা কি কাঁদা-

কাটির সময় হল নাকি? দেখতে পাচ্ছ না বন-মোরগের ডানায় চোট লেগেছে? হতভাগা শিকারীরা আজ আবার বেরিয়েছিল। কাঠি খুঁজে আন; ডানা বাঁধার জন্য লাগবে না? যাও, যাও, যত তাড়াতাড়ি পার।"

এই বলে সুন্দর পাখিটাকে কোলে নিয়ে নানা একটা পাথরের উপর বসে, ময়লা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। মায়ের থলিতে সুতো ছিল, পেনসিল-কাটা ছুরি ছিল, ন্যাকড়ার টুকরো ছিল। কানু ডানা বাঁধবার জন্য কাঠি খুঁজে নিয়ে এল। তবু সুন্দর পাখিটা দু'চোখ বুজে নানার কোলে নেতিয়ে পড়ে রইল।

কানু কেঁদে উঠল, "ও কি তবে মরে গেল, নানা?" নানা বকতে লাগল, "চুপ, পুরুষ মানুষরা কাঁদে নাকি? এদিকে আয়, এটাকে চেপে ধরে রাখ, আমি কাঠির বাড়টা বাঁধি। একে বাড় বলে।"

কি ভালো দেখতে বন-মোরগটা। সোনালি, কমলা, লালচে, গলার কাছে আবার নীল-নীল সবুজ-সবুজ ছায়ার মতো। পা দুটি চকচকে হলুদ। আস্তে আস্তে কালো চোখ দুটি খুলল। আনন্দের চোটে কানু নাচতে লাগল। নানা পাখিটাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে মার কোলে দিল। "ধরতো মা, আমি আমার জিনিসপত্র আনিগে।"

কানুও তার সঙ্গে বনের ধারে গেল। সেখানে একটা গাছের ডালে নানার বড় কোট, টুপি আর ব্যাগ্‌টা ঝোলানো ছিল। ওরা আবার মা যেখানে বসেছিলেন সেখানে ফিরে এল।

নানা বলল, "এবার বাড়ির দিকে!" মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, "বাড়ির দিকে, কাকা? কি করে বাড়ি যাব? বাড়ি যে অনেক দূরে আর আমি এক পা-ও হাঁটতে পারব না।"

নানা বলল, "কি বাজে বকছ। বাড়ি আবার কখনো দূরে হয় নাকি? ঐ যে আমাদের সামনের মোড়, ওটা ঘুরলেই তো বাসের রাস্তা। বাস্‌ আমাদের একেবারে মুলকি পাহাড়ের পায়ের কাছে নামিয়ে দেবে। ঐ বাস্‌ মুলকি থেকে বড়পানি যায়। ঐ বাসে করেই তো আমি এসেছিলাম।"

তারপর ওদের দিকে কটমট করে চেয়ে নানা বলল, "আশা করি তোমরা সারা পথ হেঁটে আসনি, মা?" মাকে চুপ করে থাকতে দেখে নানা কানুকে বলল, "সে কি, দাদু, তুমি এই রকম করে আমার মেয়েটার যত্ন কর নাকি?" কানু মাথা নিচু করে রইল।

পরে বাসের মধ্যে নানার কোল ঘেঁসে বসে কানু ফিসফিস করে বলল, "নদীর ধার দিয়ে দিয়ে যেতে হল যে, নানা। তোমার নৌকো কোথায় অপেক্ষা করছে, তা কি করে জানব?"

নানা তো অবাক! "নৌকো? কিসের নৌকো? এই কি নৌকোর কথা ভাববার সময় নাকি, দাদু? নৌকো না আরো কিছু! তাহলে পাখির দেখাশুনো কে করবে শুনি? যেই না ভালো করে জাগবে, অমনি তো যাকে পাবে তাকেই ঠোকরাবে। আর কাল বাপু আসছে না? তা হলে তার সঙ্গে কে মাছ ধরতে যাবে? নৌকোর কথা রেখে দে!"

এমনি করে সন্ধ্যেবেলায় ওরা পাখি নিয়ে বাড়ি ফিরল। আগুনের

সামনে একটা ঝুড়িতে বিছানা করে পাখিকে শোয়ানো হল। কান্থাই ওদের জন্য গরম খাবার তৈরি করে রেখেছিল। উ-বিন ওদের আশায় বাড়ির সামনের রাস্তায় পাইচারি করছিল।

আলো জ্বালা জানলাগুলো ওদের আদর করে ডেকে নিল।

পরদিন নানারকম ভালো ভালো আশ্চর্য জিনিসে বোঝাই প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে বাপু এসে পৌঁছলেন। তবে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য জিনিস হল সোনালি গাঁয়ের দিম্মা! হাসতে হাসতে তারার মতো মিটমিট করতে করতে তিনিও বাপুর সঙ্গে এসে উপস্থিত!

কানু যখন দিম্মাকে বলে দিল যে মার মুলকির চেয়ে সোনালিকে বেশি ভালো লাগে, দিম্মা বললেন, "কেন?" মা বললেন, "বাড়ির জন্য মন কেমন করে।"

দিম্মা তো অবাক! "বাড়ির জন্য মন কেমন করে? বাড়ি আবার কাকে বলে? যেখানেই থাকবে সেখানেই তো বাড়ি, বাছা। পাড়া-পড়শীরা সবাই বন্ধু-বান্ধব। এইটা তোমার বাড়ি, মা। কিছুদিনের মতো এটা আমারো বাড়ি। তোমার ছোট-মামা অবসর নিয়েছে; সে সোনালির
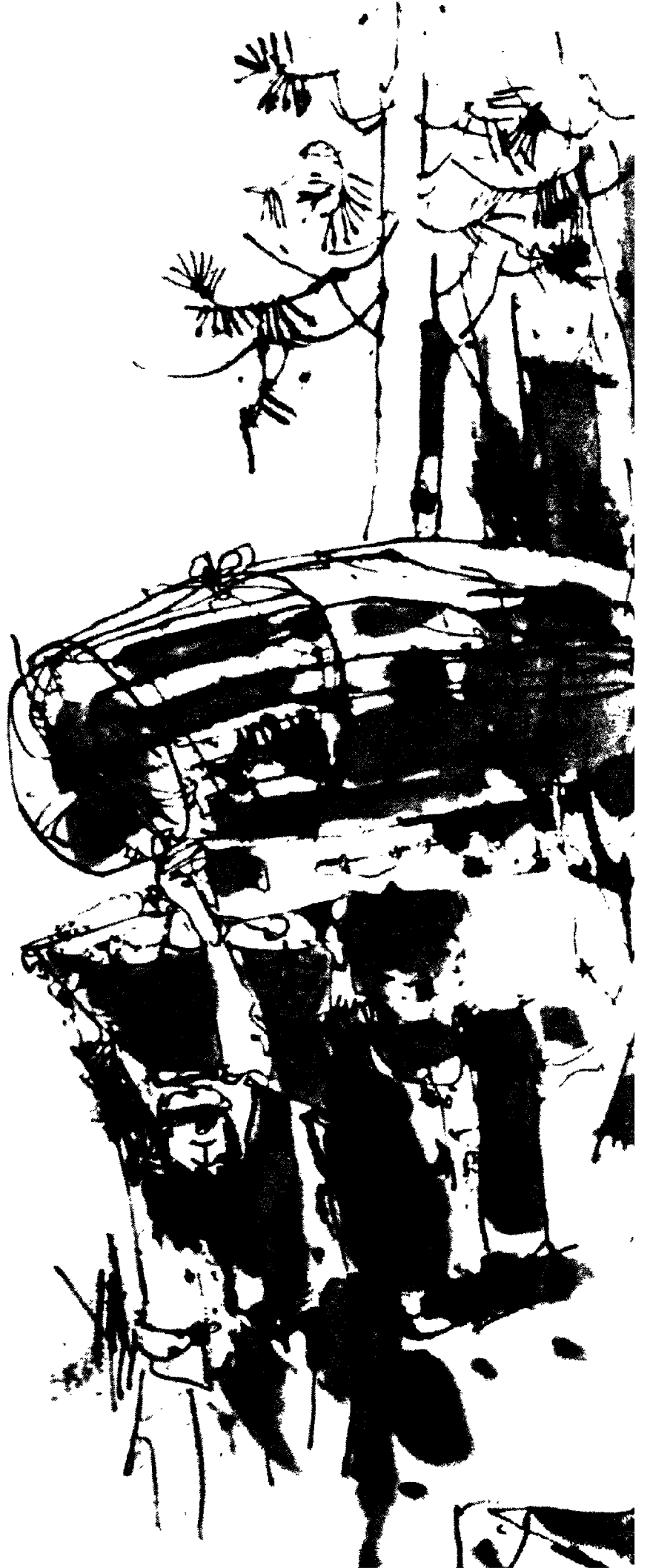
বাড়ি আগলাবে। তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমি কিছুদিন এখানে থাকতে চাই, এ জায়গাটাকে আমি বড় ভালোবাসি।”